পরিবর্ধিত সংস্করণ
টাকার গন্ধ
ড. মাহমুদ আহমদ

টাকার গন্ধ
(The Smell of Money)

ড. মাহমুদ আহমদ

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❑ মগবাজার ❑ বাংলাবাজার

টাকার গন্ধ (The Smell of Money)
ড. মাহমুদ আহমদ

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৯
দ্বিতীয় প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৯
শাওয়াল, ১৪৩০
আশ্বিন, ১৪১৬

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)
ফোন : ৯৬৬৩৭৮২

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

TAKAR GONDHO (The Smell of Money) Written by D. Mahmood Ahmad, Published by Ahsan Pablication Katabon Masjid Cumpus, Dhaka, First Edition April, 2009, Second Edition October 2009 Price Tk. 50.00 Only.

AP-59

উৎসর্গ

টাকার গন্ধ ভাল লাগে যাদের এবং
টাকার কষ্ট কাটিয়ে উঠতে চান যারা
তাদের করকমলে।

পুস্তক পরিচিতি

এক টুকরা কাগজ– টাকা, পাউন্ড, ডলার ইত্যাদি। টাকার রয়েছে ক্রয়ক্ষমতা। কিন্তু নিজস্ব কোন মূল্য নেই। এক সময় ছিলো। যখন টাকা ছিলো সোনা ও রূপার। টাকা যখন কাগজ দিয়ে তৈরি হলো তখন তাতে গন্ধ লাগলো। টাকা তখন সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হলো। বিনা যুদ্ধে বিশ্ব জয় হলো। সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে বিবর্তনের ধারায় কাগজের টাকা আজ বিলুপ্তির পথে। বিশ্ব মন্দা থেকে তা বুঝা যায়। হয়তো ফিরে যেতে হবে আবার সেই পণ্য বা পণ্যভিত্তিক মুদ্রায়। কিন্তু সে তো পরের কথা। এখন মন্দার ফলে টাকার কষ্ট বাড়ছে বিশ্বব্যাপী। তাই কাঁদে টাকা, কাঁদে মানুষ।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী দেশের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে বসে কোন কার্যকর সমাধান বের করতে পারেননি। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি? বুঝতে হলে জানতে হবে। জেনে বুঝে এখনই নিজকে বদলাতে হবে। বাজার অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। আরও কিছু করতে হবে। সময় চলে গেলে ট্রেনও স্টেশন ছেড়ে চলে যাবে। তাই এখনই সময় মন্দা মোকাবেলায় নিজেকে বদলে ফেলার। এখন সময় দিন বদলের।

মুখবন্ধ

মধুর চেয়ে মিষ্টি যে টাকা তার আবার গন্ধ কি? টাকা মানেই তো ক্ষমতা। কিন্তু না। টাকা দিয়ে সব কিছু করা যায় না । যেমন– টাকা দিয়ে বালিশ কেনা যায়; ঘুম কেনা যায় না।

টাকা কারো জন্য সম্পদ; কারো জন্য বিপদ। দুনিয়া জোড়া এখন যে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তাও এই টাকার জন্য। তাই তো টাকার এত গন্ধ।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সম্পর্কে জানতে এবং মন্দা পরিস্থিতিতে টাকার কষ্ট দূর করে জীবনকে সুখী করতে এ বই আপনাকে সাহায্য করবে।

ঢাকা
১৫ই অক্টোবর, ২০০৯ইং

ড. মাহমুদ আহমদ

টাকার গন্ধ

(The Smell of Money)

সূচীপত্র

১

গন্ধ অনুভব

টাকার গন্ধ কেমন?

"যখন আমার বাঁ চোখটা অপটিকাল হারপিসে নষ্ট হয়ে গেল, তখন বুঝিনি সে-ই আমার আশীর্বাদ। কেননা একটা চোখ দিয়ে আমি জগতটাকে চিনতে শিখলাম। শিখলাম– টাকা এমন জিনিস, যে ছেলে কম উপার্জন করে মা তাকে ভালোবাসে না।" কথাগুলো ভারত বিচিত্রায় পড়েছিলাম।

কথায় বলে–

যদি না থাকে কামাই
মা কয় না পুত
শাশুড়ি কয় না জামাই।

মূলতঃ মেয়েলোকের স্বামী পুরুষ; আর পুরুষের স্বামী হচ্ছে টাকা। টাকা সম্পর্কে এরকম আরও অনেক কথা আছে। যেমন–

টাকা হলো জগতের বাপ
টাকা হলে ছাড়ে পাপ।
জনমে টাকা
মরণে টাকা
এ জগতে শুধু টাকারই খেলা।

পৃথিবীর সবচে' ছোট্ট চিঠি– তাও টাকার জন্য লেখা। চিঠিখানা নিম্নরূপ–

টাকা নাই
টাকা চাই
ইতি কানাই

চিঠির জবাবও ছিল মহাসংক্ষিপ্ত। যেমন–

টাকা সাফ্
টাকা মাফ
ইতি তোর বাপ।

তাই টাকার গন্ধ সত্যিই অতুলনীয়।

টাকা দিয়ে দেশ জয় করা যায়। সে জয় অন্য সব জয়ের চাইতে দীর্ঘস্থায়ী। কোন দেশ জয় করা যায় তিন ভাবে।

প্রথমত: যুদ্ধ করে। যুদ্ধ করে আমেরিকা আফগানিস্তান ও ইরাক জয় করেছে। যদিও এ পদ্ধতিতে দেশ জয় করে দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় না। কারণ পরাজিত দেশের জনগণ দখলদারকে ঘৃণা করে। তাই জনগণ এক সময় জেগে উঠে এবং নিজেদের দেশকে আবার শত্রু মুক্ত করার চেষ্টা করে। তাই দখলদারিত্ব বজায় রাখতে প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হয়। যা ব্যয়বহুল।

দ্বিতীয়ত: ধর্ম প্রচার করে। ধর্ম গ্রহণের ফলে জনগণ আল্লাহর অনুগত হিসেবে বহিরাগত ধর্ম প্রচারকদেরকে নিজেদের দেশে স্বাগত জানায় এবং তাদের শাসন ক্ষমতা দান করে থাকে।

তৃতীয়ত: অর্থনৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে।

অর্থাৎ টাকার গন্ধ ছড়িয়ে । যখন কোন দেশকে অর্থ সাহায্য দেয়া হয়, তখন দাতাগোষ্ঠী যে দেশটি জয় করে নিয়েছে– তা সহজে বুঝা যায় না।

অর্থনৈতিক সাহায্যের নামে দেশ জয় করতে আক্রমণ করতে হয় না কিংবা কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা লাগে না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা সম্পন্ন হয়। তাই দেশের জনগণ টের পায় না যে তাদের দেশ অন্যের দখলে চলে গেছে।

এ ক্ষেত্রে রাস্তায় তারা সৈন্য দেখতে পায় না। তাদের ধর্মও কম বেশি অপরিবর্তিত থাকে। তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও কথা বলতে পারে। এমনকি শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা দেশে নির্বাচনও করতে পারে।

দেশ অন্যের দখলে চলে গেছে এটা জনগণকে বুঝতে না দিয়ে দেশের সম্পদ দখলদার দেশে চলে যাওয়ার সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার মাধ্যমে এক দেশ অন্য দেশের উপর স্থায়ীভাবে বিজয় লাভ করতে পারে।

আগে আমাদের দেশে মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ যা ছিল; বর্তমানে তা অনেক বেশি। বাংলাদেশের মতো গরিব দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণ ১৯৮০ সালের চাইতে ১৯৯০ সালে ৬১% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ঋণের সুদ বাবদ প্রত্যেক বছর করের বোঝা জনগণের উপর বাড়ছে। ফলে আমরা যা আয় করি তা থেকে বেশি পরিমাণ সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক বিজয়ের ফসল হিসেবে বিজয়ী দেশসমূহ আমাদের দেশের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু কি আমাদের দেশ? অন্যান্য গরিব দেশেরও একই অবস্থা। ২০০১ সালে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের Global Development Finance রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৯ সালে এঙ্গোলা ২৬১ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ শোধ করে ১১৪৪ মিলিয়ন ডলার। ক্যামেরুন ১৯০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ শোধ করে ৫৪৯ মিলিয়ন ডলার। কেনিয়া ১৯৫ ডলার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ শোধ করে ৭১৬ মিলিয়ন ডলার। ভিয়েতনাম ২৫৭ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ শোধ করে ১৪১০ মিলিয়ন ডলার। মুফতি তাকি উসমানি The Historic Judgement on Interest বইতে উল্লেখ করেছেন যে,পাকিস্তান ক্রমাগত বৈদেশিক ঋণের অতল তলে হারিয়ে যাচ্ছে এবং শক্তভাবে অর্থনৈতিক গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হচ্ছে। এক কথায় ১৯৮২ সন থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত মাত্র ৯ বছরে গরিব দেশগুলো ২.৬ বিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করেছে।

এখন সে কথা থাক্।

একটি দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী অর্থনৈতিক আগ্রাসন ছাড়াও দেশজ অর্থনৈতিক আগ্রাসন চলতে পারে।

যেমন, বিগত ১৯০০ সালে আমেরিকান কর্মচারীরা যে পরিমাণ অর্থ কর ও ঋণ শোধ বাবদ ব্যয় করত বর্তমানে তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত একজন মার্কিন নাগরিকের মাথাপিছু ঋণ ছিল ২০,৪০৩ ডলার। তার পর তা আরও বেড়েছে।

পৃথিবীতে আমেরিকানদের বলা হয় অন্যতম ধনী। কিন্তু তারা সব সময় অর্থ সংকটে ভোগে। অনেক পরিবারেরই শেষ রক্ষা হয় না যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই উপার্জন না করে থাকেন। সেখানে পুরুষ এবং নারী উভয়ই 'ওভারটাইম' কাজ করে অথবা সন্ধ্যাবেলা এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অন্যত্র 'পার্টটাইম' কাজ করে। ছেলে মেয়েরাও কাজ করে থাকে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে পারিবারিক ঝগড়া এবং পরিবার ভাঙ্গনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে টাকা নিয়ে ঝগড়া।

অর্থের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকবে (Congress shall have the power to coin money and regulate the value thereof) এ কথা কেন

মার্কিন সংবিধানে প্রথম অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে তা খুব কম মার্কিনীরাই জানে। অর্থনীতিবিদরা "সৃষ্টি" শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকেন তখন, যখন বাজারে টাকা ছাড়া হয়। তাঁদের মতে টাকা সৃষ্টি করার পর বাজারে ছাড়া হয়।

সৃষ্টি মানে যা পূর্বে ছিল না তা এখন তৈরি করা হয়েছে। কামার, কুমার ছুতার, তাঁতী বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরি করে বাজারে ছাড়ে। ঐ সকল জিনিস তাদের সৃষ্টি নয়। দ্রব্যের রূপান্তর মাত্র। যেমন- লোহাকে কামার ধারালো ছুরিতে রূপান্তর করে। অর্থাৎ কামার লোহা দিয়ে ছুরি তৈরি করে। তাঁতী সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করে। তারা কেউ কিছু সৃষ্টি করে না। বর্তমান জিনিসের রূপান্তর ঘটিয়ে নতুন জিনিস তৈরি করে মাত্র।

কিন্তু টাকার বেলায় এ কথা খাটে না। টাকার সৃষ্টি মানুষ শূন্য থেকে করে থাকে; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

অতি নগণ্য এক টুকরা কাগজকে যখন টাকা হিসেবে ছাপানো হয়, তখন রাষ্ট্রীয় আদেশ বলে তা ঐ ছুরি কিংবা কাপড়ের মূল্য হয়ে দাঁড়ায়। টাকার বিভিন্ন অংকে সত্যি সত্যি গাড়ি-বাড়ি সবই কেনা যায়। হোক টাকা কাগজের টুকরা, তাতে কি! টাকার রয়েছে ক্রয়ক্ষমতা।

সত্যিকার অর্থে টাকার ক্রয়ক্ষমতা তথা ঐ টাকা মানুষের সৃষ্ট। টাকা কোথাও তৈরিও হয় না । জন্মায়ও না। ছাপা হয় মাত্র।

তবে ছাপা হলেই টাকা সৃষ্টি হয় না। যেমন - জাল টাকা।

টাকা সৃষ্টি করা খুব লাভজনক।

কথায় বলে, টাকা দিয়ে সব কিছু কেনা যায়। টাকা হলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়। টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে সে পণ্য আবার বিক্রয় করে ১০% বা ২০% টাকা লাভও করা যায়। কিন্তু এর চাইতেও অধিক লাভ টাকা সৃষ্টির মাধ্যমে করা যায়।

কেননা টাকা ছাপানোর খরচ যে একেবারেই নগণ্য। একটি এক হাজার টাকার নোট ছাপানোর খরচ এক টাকার বেশি হতে পারে বলে মনে হয় না।

সে যাই হোক, টাকার অতি এক চমৎকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হলো 'টাকার প্রতি ভালোবাসা' যা কিনা সকল অনিষ্টের মূল। কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। দেখা যাক্ তা কি করে হয়।

সভ্য সমাজের জন্য টাকার যথেষ্ট সরবরাহ থাকা চাই। আমরা অনেক কিছু ছাড়াই চলতে পারি। কিন্তু টাকা ছাড়া একদম চলতে পারি না।

যেখানে টাকা নেই সেখানে কলের চাকা ঘুরে না। কর্মসংস্থান হয় না। উৎপাদন বন্ধ থাকে। ভোগ হ্রাস পায়। জীবন পানসে হয়ে পড়ে। কামাই রোজগারের অভাবে পারিবারিক কলহ দেখা দেয়। সমুদ্রে বাণিজ্যিক জাহাজ ভাসে না। এক দেশ থেকে পণ্য অন্য দেশে যায় না। বাঁচার লড়াইয়ে মানুষ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। সরকারি দপ্তরে কাজ ঝিমিয়ে পড়ে। টাকার অভাবে সর্বত্র মন্দা দেখা দেয়। সৃষ্টি হতে চায় অচল অবস্থা।

খুব বেশি বলে ফেলেছি মনে হচ্ছে ? মোটেই না।

টাকা সভ্য সমাজের জীবনী শক্তি। সকল বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উপায়। টাকা দিয়ে পণ্যমূল্য ঠিক করা হয়। যে মূল্যে পণ্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয়। টাকা অচল ঘোষণা করলে বা টাকার সরবরাহ কমিয়ে দিলে ব্যবসা বাণিজ্য কমে যাবে। এমনকি ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ারও উপক্রম হবে।

১৯৩০ সালে আমেরিকাতে যে মহামন্দা দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেকেরই জানা আছে। ১৯৩০ সালে আমেরিকাতে শিল্প-সামর্থ্য, উর্বর কৃষি জমি, দক্ষ কর্মক্ষম শ্রমিক ও পরিশ্রমী মানুষের কোন অভাব ছিল না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দক্ষ ও বিস্তৃত পরিবহন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। সরকারি ডাক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও ইত্যাদি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশব্যাপী চালু ছিল।

কোন যুদ্ধে আমেরিকার কোন শহর বা অঞ্চল বিধ্বস্ত ছিল না। কোন কারনে জনগণ দুর্বলও ছিল না। এমনকি দেশটিতে তখন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবও ছিল না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ সালে ছিল শুধু মাত্র ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহের অভাব।

ব্যাংক হচ্ছে সুদের ভিত্তিতে টাকা সরবরাহের একমাত্র উৎস। তাই টাকার গন্ধ বলতে মূলতঃ সুদ কে বুঝায়।

১৯৩০ সালের প্রথম দিকে মার্কিন ব্যাংকগুলো শিল্প-বাণিজ্যে ও কৃষিক্ষেত্রে নতুন ঋণ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। শুধুমাত্র চলতি ঋণসমূহ চালু ছিল।

ফলে অর্থ প্রবাহ দ্রুত সংকুচিত হয়ে পড়ে। বাজারে পণ্য বিক্রয় না হয়ে পড়ে থাকে। অর্থের অভাবে কাজের লোক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। গোটা দেশ জুড়ে মন্দা দেখা দেয়। আয় উপার্জন কমে যায়। ঋণ শোধে অপারগতা দেখা দেয়। ঋণের দায়ে ব্যাংকে বন্ধকি সম্পত্তি জনগণের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

আর ব্যাংকগুলো রাতারাতি জমি, বাড়ি-ঘর, শিল্প-কারখানা ইত্যাদির মালিক হয়ে যায়।

জনগণকে বুঝানো হল অর্থনীতিতে 'কঠিন সময়' যাচ্ছে 'অর্থ সংকটের' দরুন। টাকার খেলার নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলো জনগণের আয়-রোজগার, সঞ্চয় এবং সম্পত্তি।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ঐ মন্দার অবসান ঘটে।

যুদ্ধের সময় আর্মি ব্যারাক নির্মাণে, সৈনিকদের রেশনে, খাদ্য– পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যাংকগুলো প্রচুর অর্থ সরবরাহ করে।

অথচ এই ব্যাংকগুলোর নিকট ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে শান্তিকালীন সময়ে ঘর-বাড়ি নির্মাণ, খাদ্য, বস্ত্র ক্রয়ে সরবরাহ করার মতো অর্থ ছিল না।

একটি জাতি ১৯৩৪ সালে বিক্রি করার মতো খাদ্য উৎপাদন করতে পারেনি অর্থের অভাবে। কিন্তু বোমা উৎপাদন করে ফ্রিবোমা সরবরাহ করতে অর্থের অভাব হয়নি।

সে যাই হোক, অর্থ সরবরাহ হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়াতে কর্মক্ষেত্রে লোক নিয়োগ করা গেলো। উৎপাদন বৃদ্ধি পেল। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হলো। কারখানাগুলো পুনরায় চালু হলো। সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এলো। এভাবে মহামন্দা কেটে গেল।

কিছু রাজনীতিককে মন্দার জন্য দোষারোপ করা হলো । কিছু রাজনীতিক মন্দা কাটিয়ে উঠার কৃতিত্ব নিয়ে গেল।

অথচ প্রকৃত সত্য হলো– অর্থ সরবরাহের অভাবে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিয়েছিল। পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহের ফলে মন্দা কেটে গিয়েছিল।

কথায় বলে 'টংকাহি কেবলম্'। টাকাই সব কিছু।

সালাম পৃথিবী তোমাকে সালাম

দুনিয়াকে করেছ টাকার গোলাম।

২

গন্ধ পরিবর্তন

টাকা এলো কোথা থেকে ?

সেকালের টাকা আর এ কালের টাকা কি এক টাকা?

সেকালে কাগজের টাকা ছিল না। ছিল সোনা ও রূপার টাকা।

মানুষ সঞ্চয় করত স্বর্ণের টাকা। আর অনেকেই তা জমা রাখত স্বর্ণকারের নিকট। স্বর্ণকার জমা রশিদ দিত। ঐ রশিদে জমাকারীর নাম ঠিকানা, স্বর্ণের পরিমাণ ও স্বর্ণকারের নাম ঠিকানা উল্লেখ থাকত।

এক সময় দেখা গেল সব রকমের লেনদেনে এ রশিদগুলো ব্যবহার হতে লাগল। স্বর্ণকারের নিকট থেকে স্বর্ণ উঠিয়ে লেনদেন করার চাইতে রশিদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে লেনদেন সহজ হত। রশিদ প্রদান করা মানে স্বর্ণ প্রদান করা বুঝাত।

এভাবে রশিদগুলো হয়ে উঠলো কাগজের টাকা।“চাহিবা মাত্রই ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে” এ কথা টাকার গায়ে লিখে দেয়া হলো। অর্থাৎ টাকা নামক ঐ রশিদ ফেরত দিয়ে ইচ্ছে হলে স্বর্ণও তুলে নেয়া যেত।

তাই তখন টাকা হলো ‘স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য কাগজী মুদ্রা’। টাকার গায়ে আজও ঐ কথা লেখা আছে বটে। তবে এখন আর টাকা ফেরত দিয়ে স্বর্ণ তোলা যায় না।

কিন্তু থাক্ সে কথা।

টাকা যখন সোনা রূপার ছিল; তখন টাকার ক্রয় ক্ষমতা ছাড়াও তার নিজস্ব একটা মূল্য ছিল। সোনা সবার চেয়ে দামী। কিন্তু স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য কাগজী মুদ্রার নিজস্ব মূল্য নেই। এক টুকরা কাগজ আর এক টুকরা সোনা সমান হতে পারে না। কাগজের টাকার ক্রয়ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু নিজস্ব মূল্য নেই।

১৯১৩ সাল পর্যন্ত টাকা ‘সোনার’ হোক আর ‘স্বর্নে রূপান্তর যোগ্য কাগজের’ হোক; টাকা তৈরি করে বাজারে ছাড়ত সরকার। ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন কংগ্রেসে “দি ফেডারেল রিজার্ভ এ্যাক্ট” নামে একটি আইন পাশ করা হয়। এ আইন কাগজী মুদ্রা প্রিন্ট করে বাজারে ছাড়ার ক্ষমতা সরকারের হাত থেকে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে তুলে দিল। এমনকি বাজারে অর্থ (ডলার) সরবরাহের উপরও সরকারের নিয়ন্ত্রন রহিত করা হলো। যুক্তি দেখান হলো যে, "অর্থকে রাজনীতিমুক্ত" করা হলো দেশ ও জনগণের স্বার্থে। রাজনীতিকরা সরকার গঠন করে। নিজ স্বার্থে তারা যদি টাকা বাজারে ছাড়ে; তবে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দেশ পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় টাকা সরকার জনগণের কাছ থেকে কর আরোপ করে আদায় করবে। যদি রাজস্ব আয়ে দেশ না চলে তবে বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সরকার দেশ চালাবে। দেশের জন্য সরকার যে টাকা খরচ করে; সে টাকা জনগণের আয়।

'ট্রেজারী বন্ড' সই করার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে সরকার ঋণের টাকা পায় বটে। তবে সুদ আসলে কত টাকা ফেরত দিতে হবে তা বন্ডে উল্লেখ থাকে।

অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের ভিত্তিতে (ব্যাংক রেট) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ নেয় এবং জনগণকে ঋণ দেয়।

এভাবে সুদের ভিত্তিতে 'সরকারের' মাধ্যমে ও 'বাণিজ্যিক ব্যাংকের' মাধ্যমে টাকা জনগণের হাতে আসার নতুন ব্যবস্থা হলো।

টাকায় সুদের গন্ধ লাগল।

দেশে 'বাৎসরিক উৎপাদন' ও 'ভোগ ব্যয়' মিটাতে পরিকল্পনা মাফিক কাগজের টাকা ছাপিয়ে সুদের ভিত্তিতে সরবরাহ করা সহজ হলো। স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য কাগজের টাকা যার নিজস্ব মূল্য নেই; তা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ভালভাবে গৃহীত হলো। কাগজের টাকা মানেই এখন ক্রয়ক্ষমতা। সুদে আসলে পরিশোধ করা যাবে এমন সব লাভজনক কাজের জন্য টাকা সরবরাহের ব্যবস্থা হলো । এ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য সুদ নামক 'ঝুঁকিমুক্ত' আয় নিশ্চিত করল।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্যও অনুরূপ আয়ের ব্যবস্থা করা হলো 'আংশিক রিজার্ভ ব্যাবস্থা' (Fractional reserve system) প্রচলনের মাধ্যমে।

ব্যাংকিং আইন চালু করা হলো যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক ডিপোজিটের ১০% রিজার্ভ রেখে বাকি ৯০% সুদের ভিত্তিতে ঋণ দিতে পারবে। ফলে ডিপোজিটের নয় গুণেরও বেশি টাকা ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্জন করল।

মনে করি, করিম ১০০০ টাকা ব্যাংকে ডিপোজিট রাখল। ব্যাংক ১০০০ টাকার ১০% অর্থাৎ ১০০ টাকা রিজার্ভ রেখে বাকি ৯০% অর্থাৎ ৯০০ টাকা রহিমকে

ঋণ দিল ১৫% সুদে। এ ঋণ দিতে ব্যাংক রহিমের নামে একটি ডিপোজিট হিসাব খুলে ৯০০ টাকা জমা করে। নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় ব্যাংক এই ৯০০ টাকা ডিপোজিটের ১০% অর্থাৎ ৯০ টাকা রিজার্ভ রেখে বাকি ৮১০ টাকা সেলিমকে ১৫% সুদে ঋণ দিতে পারে। সেলিমের নামে একটি ডিপোজিট একাউন্ট খুলে ঐ ৮১০ টাকা জমা করা হয়। পুনরায় এই ৮১০ টাকার ১০% অর্থাৎ ৮১ টাকা বাদ দিয়ে বাকি ৭২৯ টাকা মতিনকে ঋণ দিতে পারে ১৫% সুদে। মতিনের নামে ডিপোজিট একাউন্ট খুলে ঐ ৭২৯ টাকা জমা করা হয় এবং ১০% অর্থাৎ ৭২.৯০ টাকা বাদ দিয়ে বাকি ৯০% অর্থাৎ ৬৫৬.১০ টাকা ব্যাংক ১৫% সুদে জব্বারকে ঋণ দিতে পারে।

এভাবে Money multiplyer পদ্ধতিতে ১০০০ টাকা ডিপোজিটের উপর ভিত্তি করে ৯০০০ টাকার বেশি কৃত্রিম টাকা (Bank money or accounting money or digital money) সৃষ্টি করে তার উপর সুদ ধার্য করে সুদে এবং আসলে লাভবান হওয়ার ব্যবস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য হয়েছে।

অবস্থা দাঁড়াল এই যে, টাকা ছাপানোর ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা সৃষ্টি করে এবং সুদের উপর ঐ টাকা ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকও 'ব্যাংকিং আইনের ক্ষমতা বলে' কৃত্রিম টাকা সৃষ্টি করে এবং সুদের উপর ঐ টাকা ঋণ দেয়। ফলে নিজস্ব মূল্যহীন কাগজের টাকা অনেক বেশি চঞ্চল হলো ।

আরও বেশি গন্ধ লাগল টাকাতে।

ব্যাংক ব্যবস্থার বদৌলতে দেশে টাকা যোগানোর ব্যবস্থা সরকারের হাত থেকে ফস্‌কে গিয়ে নতুন রূপে সুসংগঠিত হলো ।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই অনেক টাকা। কিন্তু প্রকৃতিতে স্বর্ণের যোগান সীমিত। পক্ষান্তরে ছাপাখানায় ইচ্ছামত কাগজের টাকা ছাপান যায়। কাগজের টাকা শুরুতে স্বর্ণের রশিদ হিসেবে বাজারে সীমিতভাবে চালু হয়। পরবর্তীতে স্বর্ণের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাপক পরিমাণ কাগজী মুদ্রা চালু হয়। ইতিমধ্যে আরও অনেক বেশি পরিমাণ টাকা চালু করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে টাকাকে স্বর্ণে রূপান্তরিত ভিত্তির উপর ধরে রাখা গেল না।

নতুন গন্ধে টাকা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন "কাগজী মুদ্রা স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য" ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন। তিনি ডলারের পিছন থেকে

'গোল্ড রিজার্ভ' সরিয়ে ফেলে অনেক বেশি পরিমাণে ডলার ছাপানোর সুযোগ করে দিলেন।

নতুন এ ব্যবস্থায় কাগজী মুদ্রাকে বলা হলো হুকুমী মুদ্রা (Fiat Money)।

সরকার হুকুম করেছে এক টুকরা কাগজ ১০, ৫০, ১০০ ইত্যাদি মূল্যমানের ডলার হিসেবে চলবে।

সরকারের এ 'হুকুম' হয়ে উঠল কাগজী মুদ্রার ভিত্তি ঐ 'গোল্ড রিজার্ভের' বিকল্প হিসেবে।

তাই প্রয়োজন মাফিক যে কোন কাগজী মুদ্রা বাজারে ছাড়তে আর কোন বাধা রইল না। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর অর্থনীতিতে মন্দা কাটিয়ে উঠ্‌তে যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা পূরণ হলো ঐ হুকুমী মুদ্রা দ্বারা।

কাগজের ডলার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (High powered money) হলো। ফলে একদিকে অর্থনৈতিক উন্নতি হলো বটে। তবে অনেক বেশি কাগজী মুদ্রা বাজারে এল। মূল্যস্ফীতি ঘটল।

এই প্রথম টাকা ক্রয়ক্ষমতা হারাল মূল্যস্ফীতির দরুন। কিন্তু টাকার পিছনে গোল্ড রিজার্ভ থাকা অবস্থায় কাগজের টাকার ক্রয়ক্ষমতা অটুট ছিল। স্বর্ণের নিজস্ব মূল্য সর্বাধিক - এই কারনে। একদিকে কাগজ দিয়ে তৈরি টাকার নিজস্ব মূল্য নেই, অপরদিকে তা ক্রয়ক্ষমতা হারানোর পর্যায়ে চলে যাওয়াতে আম ও ছালা দু'টাই হাতছাড়া হওয়ার মতো দশা হলো।

টাকা হলো আরও গন্ধযুক্ত।

তাই কাগজী মুদ্রাকে ম্যানেজ করার প্রয়োজন দেখা দিল যাতে তা ক্রয়ক্ষমতা না হারায়। অর্থাৎ টাকা হলো এ পর্যায়ে ম্যানেজ করার বিষয় (Managed Money)।

সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে পণ্য ক্রয়ে যদি বেশি টাকা লাগে তাকে মূল্যস্ফীতি (Inflation) বলে। মূল্যস্ফীতির ফলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে। বিদেশী মুদ্রার বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের ফলেও টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে। সুতরাং টাকার ক্রয়ক্ষমতাকে ধরে রাখতে এখন আর টাকা অলস ফেলে রাখা যায় না। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অলস টাকার পরিমাণ যেন বাড়ে সে ব্যবস্থা করতে হয়।

তাই ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে হয় বা বিনিয়োগ করতে হয়। ব্যাংক সময়ের

প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে থাকে জমাকারীকে। বেশি সময় ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে বেশি টাকা পাওয়া যায়। কম সময় রাখলে কম টাকা পাওয়া যায়। যেমন আমাদের দেশে ৬ বছর ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে দ্বিগুণ হয়।

কাগজের টাকা ম্যানেজ করে যখন আরও টাকা আয় করার পথ সুগম হলো, তখন এক দেশ অন্য দেশকে উচ্চ সুদের হারে ঋণ দেয়া শুরু করল।

দাতা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিক পরিমানে টাকা ছাপাতে শুরু করল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে - দেশ দেশান্তরে যত টাকার পণ্য আমদানি-রপ্তানী হয়েছে তার চেয়ে বেশি টাকা ঋণ হিসেবে লেনদেন হয়েছে।

অর্থাৎ টাকায় নতুন গন্ধ যোগ হলো– কাগজের টাকা হল গরম (Hot Money)।

পণ্যের মতো টাকাও ক্রয়-বিক্রয় হতে শুরু করল। টাকা ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারকে বলা হলো মুদ্রা বাজার (Money Market)।

পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে কাগজের টাকার প্রচলন; সে টাকা এখন নিজেই পণ্যের মতো বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। ফলে পণ্য ও সেবার প্রকৃত মূল্যের চেয়ে শত সহস্রগুণ বেশি টাকা বাজারে চলে এসেছে।

মুদ্রাবাজারে লাভবান হওয়ার জন্য টাকা বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানোর উপায় (Financial Engineering) যেমন, ফরওয়ার্ড, ফিউচার, অপশন ও সিকিউরিটাইজেশান অবলম্বন করা হলো। ১৯৮০ দশকে এই সমস্ত ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট চালু করা হয়। তাই টাকা দিয়ে টাকা উপার্জনের দিগন্ত আরও প্রসারিত হলো। বিনিয়োগকারীরা আরও বেশি টাকা মুদ্রাবাজারে বিনিয়োগ করতে লাগল। তাদের টাকার চাহিদা পূরণ করতে আরও টাকা ছাপানো বা সৃষ্টি করা হলো।

টাকা হয়ে উঠল মুদ্রা বাজারে শুধু 'টাকা দিয়ে টাকা' উপার্জনের কৌতুকপূর্ণ অর্থ (Funny money)। সৃষ্টি হলো Financial Economy যা Real Economy কে ছাড়িয়ে গেল।

ফলে পণ্য ও সেবার বিনিময় মূল্য হিসাবে টাকার ভিত্তি আরও দুর্বল হলো । পণ্য ও সেবার মূল্য হিসাবে ব্যবহার হতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন পৃথিবীতে; তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি টাকা সৃষ্টি করা হলো।

এ অতিরিক্ত টাকা হলো বুদবুদ টাকা (Bubble Money)।

তাই টাকা হলো সর্বাধিক গন্ধযুক্ত।

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ মূলবান পণ্য সোনা ও রূপার আকারে যে টাকার প্রচলন হয়েছিল তা যখন বুদবুদে পর্যবসিত হয়েছে; তখন অবশ্যই তা ফুটুস (Burst) হয়ে যেতে বাধ্য। হয়েছেও তাই। চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা তার প্রমাণ। নিম্নে চিত্রে তা দেখান হলো।

চিত্র–১: টাকার বিবর্তন

৩
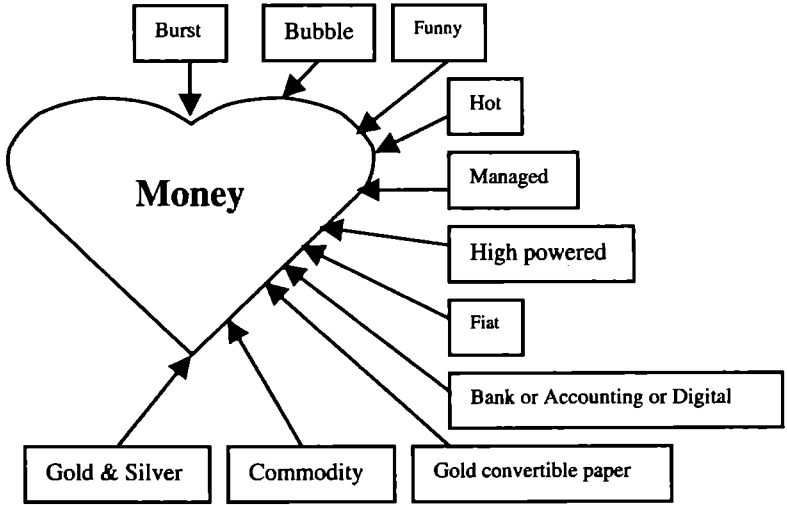
টাকার কষ্ট

কাগজের টাকা জন্ম সুদে। মৃত্যুও সুদে। তাইত টাকার এত কষ্ট।

ঋণের শর্ত হিসেবে অতিরিক্ত যা কিছু– তাই সুদ। ঋণের বর্ধিত অংশ সুদ। ঋণের সাথে কিছু যোগ করলে তা সুদ।

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাগজে ছাপান টাকা প্রথম সুদের ভিত্তিতে সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাজারে ছাড়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ছাপানো টাকা সুদে ঋণ নিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া অন্য কেউ টাকা ছাপাতে ও বাজারে ছাড়তে পারবে না।

এ টাকাকে বলা হলো Narrow Money (M_1).

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুদের হার কম বেশি করার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রদান করা হলো । এই সুদের হারকে বলা হলো 'ব্যাংক রেট'। মুদ্রাস্ফীতি বেশি হলে স্থানীয় বাজারে কম বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়।

এভাবে সুদের হার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ তথা সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের চাবি কাঠি হয়ে উঠল।

অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকেও সুদে টাকা জমা রাখা ও প্রদানের ব্যবস্থা হলো। এভাবে সুদ অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে গেল।

সুদ টাকার গন্ধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল।

তাই অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন সুদ হলো কাগজী মুদ্রার সহজাত মূল্য। সরিষায় ভূত থাকলে যেমন তাড়ানো যায় না; কাগজী মুদ্রার সুদও তেমন।

কাগজ দিয়ে তৈরি টাকার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। অলস ফেলে রাখলে ক্রয়ক্ষমতা কমে। সুদে তা কমে না। তবে কত সুদে কি পরিমাণ ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা পায় তা নির্ধারণ করা যায় না।

টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে মূল্যস্ফীতি ও অবমূল্যায়নের ফলে। মূল্যস্ফীতি সঠিকভাবে আগাম নির্ধারণ করা যায় না। টাকার ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করতে আন্দাজ করে সুদ ধার্য করতে হয়। সুতরাং বর্তমান ও ভবিষ্যতের ফাঁদে আটকে পড়েছে টাকা। তাই টাকার অর্জিত সুদ ও হারান ক্রয়ক্ষমতা কখনো এক হয় না।

অতএব সুদ গ্রহণ করার কোন মানে হয় না। তাই টাকাকে গন্ধমুক্ত তথা সুদ মুক্ত করা দরকার।

সুদের গন্ধে অতুলনীয় কাগজের টাকা এখন দুনিয়া জোড়া যে আর্থিক মন্দা সৃষ্টি করেছে; তাতে টাকার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠেছে। রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন সোনা ও রূপা যার নিকট থাকবে না সে দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে না।"

চিত্র-১ এ প্রদর্শিত টাকার গন্ধ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা থেকেও বুঝা যায় যে টাকার পরিমাণ পৃথিবীতে বাড়তে বাড়তে এখন টাকার মরণ দশা।

আইসল্যান্ড তার দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে পণ্যমুদ্রা চালু করার প্রস্তাব বিবেচনা করছে।

যদি সকল দেশ অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তবে ফুটুস হয়ে গেছে বা ফুটুস হয়ে যাচ্ছে এরকম কাগজী মুদ্রা ত্যাগ করে পৃথিবী টাকার বিবর্তন চিত্রের (চিত্র-১) বাম দিকের 'পণ্য মুদ্রা বলয়ে' প্রবেশ করতে পারে; যেখানে সে পূর্বে ছিল।

টাকার মৃত্যু বলতে অগ্রহণযোগ্যতাকে বুঝায়। জাল টাকা বা অচল ঘোষিত টাকা মৃত।

কাগজের টাকা 'ছাপানোর ভিত্তি' স্বর্ণ রিজার্ভ থেকে মুক্ত হয়ে যখন টাকা ঋণের আকারে বিস্তার লাভে সীমাহীন ক্ষমতা অর্জন করল; তখন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ঐ টাকার মৃত্যুপরোয়ানাও জারি হয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে। নিউটন বলেছেন, "প্রত্যেক কাজের সমান সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে" (Every action has equal and opposite reaction).

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মার্কিন ডলার যখন গরিব দেশসমূহের দুর্বল মুদ্রাকে কুপকাত করে দুর্বার গতিতে ঋণ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ছিল; তখন ১৯৮০ এর দশকে আবিষ্কৃত কিছু ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট যেমন- 'ফিউচার', 'সোয়াপ' এবং 'অপশন' বেশ লাভজনক একটি ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট তৈরি করলো 'ঋণের ঝুঁকি' বেচা-কিনা করতে। ঐ প্রোডাক্টগুলো মার্কেটে প্রচুর অর্থ জড়ো করতে সক্ষম হলো।

ফলে একদিকে ঋণ প্রদানকারীদের জন্য যেমন তারল্য সৃষ্টি হলো তেমনি অপরদিকে ডলার দুর্জয় গতি লাভ করল। আরও অধিক পরিমাণে ডলার প্রিন্ট করে বাজারে ছাড়া হলো যা ঋণের আকারে ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে বেচা-কিনা হতে লাগল।

এ পর্যায়ে ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে নতুন আবিষ্কার হলো ‘ডেরিভেটিভ্‌স’ (Derivatives); যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মূল্য উঠা-নামার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে রক্ষা (Hedge) পাওয়া।

কিন্তু ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ আয় (সুদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করতে ফট্‌কা কারবারির ন্যায় ডেরিভেটিভ্‌সকে ব্যবহার করল। বস্তুত: এ সকল নতুন প্রোডাক্টস আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটকে জুয়ার আখড়ায় (Casino) পরিণত করতে বিনিয়োগকারিদেরকে ব্যাপক সহায়তা করেছে।

জুয়া খেলায় এক পক্ষ যা হারায় অপরপক্ষ ঠিক তা লাভ করে। অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন (Value addition) হয় না। জুয়া অর্থহীন টাকার খেলা (Zero sum game)। ফলে অর্থ হয়ে পড়ে অর্থহীন। এ অবস্থায় টাকার মৃত্যু ঘটে।

১৯৯০ এর দশকে এশিয়ান টাইগার নামে খ্যাত দেশগুলোর (থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, তাইওয়ান) ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে জুয়াড়ি বিনিয়োগকারিদের মাধ্যমে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ হয় এবং শক্তিশালী এক অর্থহীন অর্থবাজার সৃষ্টি হয়।

নানাবিধ কারণে এক পর্যায়ে ফান্ড ম্যানেজারগণ মনে করল যে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা আর আর্জন করা যাবে না। তখন কিছু বৃহৎ ফান্ডের ম্যানেজার বাজার থেকে ফান্ড তুলে নিল। তাদের দেখা দেখি ছোট ফান্ড ম্যানেজারগণও ফান্ড তোলা শুরু করল।

ফলে বাজারে আতংক ছড়িয়ে পড়ল। সবাই যখন ফান্ড তোলা শুরু করল; তখন ঐ সকল দেশে ডলারের পর্যাপ্ত মওজুদ ছিল না যে তারা তাদের নিজস্ব মুদ্রা রক্ষা করতে পারে। ফলে ঐ সকল দেশের স্থানীয় মুদ্রা (থাই বাথ, মালয়েশিয়ান রিংগিত, তাইওয়ান ডলার, কোরিয়ান ওন) ৩০% থেকে ৪০% অবমূল্যায়ন রাতারাতি ঘটলো। ইন্দোনেশিয়ান রূপীর ৮০% অবমূল্যায়ন হলো।

বলা হলো এশিয়াতে আর্থিক বিপর্যয় (Asian Financial Debacle) ঘটেছে।

অবমূল্যায়ন টাকার এক ধরনের মৃত্যু।

অবমূল্যায়নের ফলে টাকার মান কমে যায়। টাকা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে। মানুষের কষ্ট বাড়ে।

সে কষ্ট টাকার কষ্ট। “কষ্টে আছি” শব্দ দুটি হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক প্রতিচ্ছবি। যেখানে কাঁদে মানুষ কাঁদে টাকা।

পৃথিবীতে টাকার কষ্ট এখন অনেক বেশি। টাকার উৎস যে ব্যাংক; তা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক মন্দা।

ব্যাংক বন্ধ হলে টাকা পাওয়া যায় না। ব্যাংক ঋণ চালু না থাকলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়ে পড়ে। মানুষের আয় কমে যায়। টাকার অভাবে বাজারে জিনিস সস্তায় বিক্রি হয়। তারপরও ক্রেতা পাওয়া যায় না। এ অবস্থাকে বলা হয় মন্দা।

ঋণভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মধ্যমণি হচ্ছে ব্যাংক। সুদ হচ্ছে চালিকা শক্তি।

কিন্তু ব্যাংক বন্ধ হচ্ছে কেন?

ব্যাংক হলো টাকার ব্যাবসা। এখানে টাকায় টাকা আনে, রতনে রতন চেনে। ঘুঘু দিয়ে ঘুঘু শিকার করার মতো ব্যাপার।

পৃথিবীতে ব্যাংক ব্যবসায় হলো একমাত্র ব্যাবসায় যেখানে মূলধন যত কম, আয় (Earning per share) তত বেশি।

পরিশোধিত মূলধন দিয়ে ব্যাংক কোম্পানি খোলার অনুমোদন নিয়ে ব্যাংকের শাখা খুললেই হলো। জনগণ ব্যাংকে টাকা জমা রাখে। জমা টাকার উপর ব্যাংক যে সুদ প্রদান করে; তার চাইতে বেশি সুদে ব্যাংক ঋণ দেয়।

প্রদত্ত সুদ ও আদায়কৃত সুদের পার্থক্য ব্যাংকের আয়। তাছাড়া অন্যান্য আয়ও ব্যাংক করে থাকে।

তাই অধিক আয়ের জন্য ক্রমাগত বেশি 'ডিপোজিট' ও 'ঋণ' সৃষ্টি ব্যাংককে করতে হয়। এটা অনিবার্য উন্নতি (Imperative growth)। এর কোন শেষ নেই।

M_1 এর উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট এ টাকাকে বলা হলো Broad Money (M_2).

মোট আয় যত বেশি; প্রতি শেয়ারে আয়ও তত বেশি। আয় যত হয় তত ভাল। যত গুড় তত মিষ্টি।

ক্রমাগত ডিপোজিট সৃষ্টি ও ঋণ প্রদান এবং ঋণের বাজারে সুদকে মূল্য ধরে বিভিন্ন ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্ট এর বেচা-কিনা ব্যাংকারদেরকে জুয়াড়ি ও লোভী করে তুলেছে।

লাভ ও লোভের এ খেলায় অর্থ যোগান দিতে, ড. ওমর চাপড়ার মতে, প্রকৃত অর্থনৈতিক পণ্য ও সেবার মূল্যের চাইতে ১০ ট্রিলিয়ন বেশি মার্কিন ডলারের ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অর্থকে বলা হলো M3.

এ বিশাল ঋণের বস্তুগত বা বাস্তব কোন ভিত্তি না থাকাতে ঋণের বাজারে বিপর্যয় (Credit crunch) দেখা দিয়েছে। তাই তারল্য সংকটে অর্থাৎ নগদ টাকার অভাবে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে মন্দা। নিম্নে চিত্রে তা দেখান হলো।
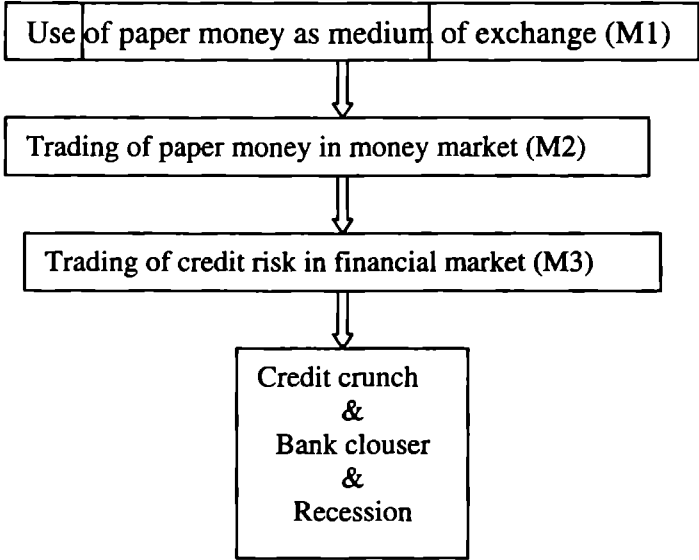
উত্তর উত্তর বেশি বেশি ডিপোজিট ও ঋণ সৃষ্টি যেমনি একটি পদ্ধতিগত ব্যাপার বা regulatory bussiness ব্যাংক বন্ধ হওয়াটাও তেমনি একটি পদ্ধতিগত ব্যাপার (Systematic clouser)।

বর্তমান বিশ্বে বিশাল ঋণের বস্তুগত বা বাস্তব কোন ভিত্তি না থাকার আরও কারণ হলো+ ক্রমাগত ঋণ সৃষ্টির ফলে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা Equity base দুর্বল হয়ে সঠিকভাবে Asset valuation করতে না পারার কারণে। তাছাড়া ১৯৩৩ সালের Glass Steagall Act (যেখানে বলা হয়েছিল Banking, stock broking, mortgage provision and insurance had to be separated activities) এর অবসান ঘটিয়ে শেয়ার ব্যবসায়, বন্ধকী সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায় এবং বীমা ব্যবসায়কে ব্যাংকিং এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

পৃথিবীটা হচ্ছে একটা গ্রহ (Planet)। যার ধারণ ক্ষমতা সীমিত। এর রয়েছে প্রতিবেশ Ecosystem ও পরিবেশ Environment। ব্যাংক ঋণের হাত ধরে ক্রমাগত শিল্পায়ন ও আকাশ ছোঁয়া বস্তুগত উন্নতি পরিবেশ বিপর্যয় থেকে শুরু করে নৈতিক বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তোলে।

পরিবেশ বিপর্যয়ে ফলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিমালয়ের বরফ গলে ফাটল দেখা দিয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে বিশাল বরফ খণ্ডের। এসব বরফ খণ্ড দ্রুত গলে যাচ্ছে এবং এতদঅঞ্চলে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে বলে নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডুতে গত ৩১ আগস্ট ২০০৯ তারিখে The South Asian Climate Change Conference এ বক্তারা জানিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন, "হিমালয় পর্বত শৃঙ্গের বরফের রাজ্য হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র পানির আধার (Water Tower)। যেখান থেকে এ অঞ্চলের প্রধান নদী যেমন, গঙ্গা, সিন্ধু, হলুদ, ব্রহ্মপুত্র এবং মেকং নদী মিষ্টি পানি নিয়ে বয়ে চলেছে। এসব নদী মরে যাবে যদি বরফ দ্রুত গলে যায়।" তাই বক্তারা শিল্পায়নের ফলে ক্রমশঃ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এ অঞ্চলের দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

জাতিসঙ্ঘ জানিয়েছে বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ হয় পর্যাপ্ত পানি পায় না অথবা তাদের কাছে পৌঁছায় না যথাযথ মানের পানি। এদিকে অপরিশোধিত পানি প্রতি বছর ২০ থেকে ২২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ২০ লাখ টন আবর্জনা এসে পড়ছে বিশ্বের যাবতীয় নদী, হ্রদ ও জলাশয়ে। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরাজেল্ডিন বলেছিলেন, 'বিংশ শতাব্দিতে যুদ্ধের মূল কারণ যদি হয় থাকে তেল, তাহলে একুশ শতকে বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের কারণ হবে পানি।' এ হলো পরিবেশ বিপর্যয়।

নৈতিক বিপর্যয়ের কথা বলতে গেলে কেমন 'বটতলা বটতলা' লাগে। তাই সে কথা এখন থাক্।

১৯৭৩ সালে বৃটিশ লেখক E.F Schumacher ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির নামে অন্তহীন বাড়াবাড়ি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে Small is Beautiful নামে একটি বই লিখেছেন। এখন বুঝা যাচ্ছে Small is beautiful and practical also. ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির নামে অন্তহীন ঋণ যে মহামন্দার জন্ম দিয়েছে; পৃথিবী তা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না।

কারন আকাশ ছোঁয়া উন্নয়ন; লাভে, লোভে এবং ভোগে মানুষের চরিত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে কল্পনার বাইরে। বুশকে জুতা মারার মতো।

বর্তমানে যে মন্দা শুরু হয়েছে তা কেটে উঠার কোন পথ খোলা আছে বলে

মনে হয় না। তাই টাকার কষ্ট এখন অনেক বেশি। ভবিষ্যতে এ কষ্ট আরও বাড়তে পারে।

কেননা গত ১৫ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট বুশের নেতৃত্বে জি-২০ নামে পরিচিত পৃথিবীর শীর্ষ ধনী ২১ টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক হয় সম্মিলিতভাবে মন্দা মোকাবেলার উপায় খুঁজে বের করতে। কিন্তু বৈঠকটি বজ্র আঁটুনির ফস্‌কা গেরোতে পরিণত হয়েছে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, নিজ নিজ দেশের মন্দা মোকাবেলায় প্রত্যেক দেশ স্বীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সম্মিলিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদানের মাধ্যমে এ শীর্ষ বৈঠক শেষ হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতা পুঁজিবাদকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে; যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন। পুঁজির বিকাশের স্বার্থে লাভ, লোভ, শোষণ, লুণ্ঠন, আগ্রাসন, জুয়া, Casino ইত্যাদিতে অভ্যস্ত পুঁজিবাদ মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, "বর্তমান পুঁজিবাদ Casino তে পড়ে খারাপ অবস্থায় চলে গেছে।

শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের ফলে টাকার বর্তমান কষ্ট শুরু হয়েছে। মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার ফলে সারা বিশ্বে মন্দা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটি খুলেই বলি।

১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালষ্ট্রীট এ শেয়ারের দরপতনের ফলে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আনবিক বোমা মারে যুক্তরাষ্ট্র। বীভৎস এ ঘটনায় যুদ্ধ থেমে যায়। একক শক্তিধর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে যুক্তরাষ্ট্র।

ঠিক এ সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র দেশসমূহ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী বৃদ্ধি করে এবং স্বর্ণ দ্বারা মূল্য পরিশোধে তাদেরকে বাধ্য করে।

১৯৪৫ সাল নাগাদ বিশ্বের প্রায় ৮০% স্বর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে জমা হয়। ফলে স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য কাগজের ডলার বিশ্বের সকল দেশে 'একক রিজার্ভ মুদ্রা' (Single currency reserve) হিসেবে গৃহীত হয়।

বিশ্বের সর্বত্র মার্কিন ডলার 'সোনার চেয়ে নিরাপদ মুদ্রা' হিসেবে বিবেচিত হয়। চারিদিকে ডলারের জয় জয়কার অবস্থা শুরু হয়।

যুক্তরাষ্ট্র এত বেশি পরিমাণ ডলার ছাপিয়ে বিশ্ব বাজারে ছাড়া শুরু করল যে মনে

হচ্ছিল আগামীকাল বলতে কিছু নেই; আজই সব ডলার ছাপাতে এবং ছাড়তে পারলেই লাভ।

পরবর্তী কয়েক যুগ ধরে বহির্বিশ্বে দেশে দেশে যুদ্ধ সংঘটিত করা, গণতন্ত্র কায়েম করা, দুর্যোগ ও উন্নয়ন সাহায্য ইত্যাদি বাবদ যুক্তরাষ্ট্র অসংখ্য পাহাড় পরিমাণ ডলার বিদেশে পাঠায়। তাতে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে মূল্যস্ফীতি ঘটেনি।

বরং দেশে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডলার জমা রাখতে নতুন নতুন ভল্ট তৈরি করতে হয়েছে। সর্বত্র মানুষের সঞ্চয়, রিজার্ভ হয়ে উঠলো স্বর্নের পরিবর্তে ডলারে। যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৬৬ শতাংশ। দুনিয়ার মানুষ আমেরিকানদের চাইতে পাঁচগুণ বেশি ডলার সঞ্চয় করেছিলো।

১৯৭১ সালে কিছু দেশ তাদের জমানো ডলারের কিছু অংশ ফেরত দিয়ে স্বর্ণ পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু ডলার নামক কাগজ ফেরৎ নিয়ে স্বর্ণ প্রদানে যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকৃতি জানায়।

"স্বর্ণ কাগজী মুদ্রার ভিত্তি" এবং "চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে"- ১৯৪৫ সালে 'ব্রেটেন উড্ কনফারেন্সে' গৃহীত এই চুক্তি লঙ্ঘন করে যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং ডলারের ভিত্তি 'স্বর্ণ রিজার্ভ' আর রইল না।

এমতাবস্থায় কাগজী মুদ্রা ডলারকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য রাখতে কিছু একটা করার প্রয়োজন দেখা দিল।

তাই কাগজের তৈরি ডলারকে শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গ্রহণ করে; সে পদক্ষেপ নেয়া হলো।

প্রথমেই প্রধান তেল রপ্তানীকারক দেশ সৌদি আরব এবং পরে ওপেকভুক্ত অন্যান্য তেল রপ্তানীকারক দেশগুলোকে বাধ্য করা হলো শুধু ডলারে তেল বিক্রি করতে।

তাতে আরও একটি সুবিধা হলো। নিজেদের ছাপানো 'ডলার নামক কাগজ' দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তেল আমদানি করতে পারল। অন্য কোন দেশ এ সুবিধা পেল না।

অন্যান্য দেশ নিজেদের রপ্তানীর বিনিময়ে অর্জিত ডলার দিয়ে তেল আমদানি করতে হলো।

এভাবে ডলার 'একক মুদ্রা' হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ঘরে বাইরে 'বিনিময়ের মাধ্যম' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। মার্কিন ডলার হলো 'প্রেট্রো' ডলার। 'স্বর্ণের ভিত্তি' থেকে 'তেলের ভিত্তির' উপর দাঁড়াল মার্কিন ডলার।

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ডলারের "স্বর্ণ ভিত্তি" বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে যুক্তরাষ্ট্র আবার ডলার ছাপানোর আরও বেশি সুযোগ পেল। স্বর্ণের উপর ভিত্তি করে অধিক পরিমাণ ডলার ছাপাতে হলে অধিক পরিমাণ স্বর্ণও যোগাড় করতে হত। কিন্তু প্রকৃতিতে স্বর্ণের যোগান সীমিত। ডলার প্রিন্টের স্বর্ণভিত্তি দূর করতে সক্ষম হওয়াতে তাবৎ পৃথিবীর পণ্য ও মানুষ বিনামূল্যে, (অর্থাৎ শুধুমাত্র ডলার নামক কাগজ ছাপিয়ে) আমদানি করতে যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা হলো।

এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি বেড়ে গেল। আমদানি ব্যয়, ঋণ ও সাহায্য বাবদ অসংখ্য পর্বত পরিমাণ ডলার প্রেরণ করা হলো যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে। তাতে দেশটির মধ্যে মূল্যস্ফীতি ঘটলো না। বরং তাবৎ বিশ্বের মানুষ ও সম্পদ ফাও আমদানি করে আরও শক্তিশালী হলো দেশটি।

তাই ডলার ছাপানোর কোন সীমা রইল না বটে। কিন্তু ডলারের মূল্য হয়ে পড়লো কৃত্রিম। ডলার নামক এক টুকরা কাগজ 'স্বর্ণ ভিত্তি' হারিয়ে শুধুমাত্র 'বিনিময়ের মাধ্যম' হয়ে পড়ল।

শুধু 'মূল্য' হিসেবে বিবেচিত 'বিনিময়ের মাধ্যম' অবশ্যই কৃত্রিম। ডলারের কৃত্রিমতাই টাকার কষ্ট তৈরি করল। পৃথিবীর সকল দেশের টাকার ভিত্তি যেহেতু 'মার্কিন ডলার রিজার্ভ'।

বিনামূল্যে পণ্য ও মানুষ ক্রয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা দেখে ফ্রান্স ও জার্মানীর শাসকদেরও ইচ্ছা হলো ঐ ক্ষমতায় ভাগ বসাতে।

১৯৯৯ সনে তারা 'ইউরো' মুদ্রা চালু করেন।

ইউরো চালু হওয়ার একমাস পরে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ডলারের পরিবর্তে ইউরোতে তেল বিক্রির ঘোষণা করেন।

২০০০ সন থেকে ইরাক ইউরোতে তেল বিক্রি শুরু করে এবং তাদের কাছে রক্ষিত ডলার ইউরোতে পরিবর্তন করে।

এই প্রথম ডলার বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ডলারের পিছনে 'গোল্ড রিজার্ভ' থাকলে ডলারের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হত না।

২০০৩ সনের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমন করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ, ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট ধ্বংস হলেও ধ্বংস হয়নি বাগদাদের তেল মন্ত্রণালয় ও তেল

ক্ষেত্রগুলো। কারণ কাগজের তৈরি ডলারকে রক্ষা করতে হলে তেল সম্পদকে রক্ষা করতে হবে।

ইরাক দখল করে যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় ডলারে তেল বিক্রি শুরু করে। এ কাজ যদি তারা না করত তবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিত।

২০০৩ সনের প্রথম ভাগে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগোশেভেজ তাঁর দেশের অর্ধেক তেল ইউরোতে বিক্রির ঘোষণা করেন। ঐ বছর ১২ এপ্রিল তারিখে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত শক্তি তাঁকে অপহরণ করে এবং অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু জনগণ ও সামরিক সহায়তায় তা ব্যর্থ হয়।

২০০০ সনের নভেম্বর মাসে এক ইউরোতে ০.৮২ ডলার পাওয়া যেত। কিন্তু ২০০৩ সনে যখন ইরাকী তেল পুনরায় ডলারে বিক্রি শুরু হলো তখন পুনরায় ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেল।

অবস্থা যখন দাঁড়ালো এই যে "তেল না হলে ডলার চলে না;" তখন ২০০৪ সনের জুন মাসে ইরান ইউরোতে তেল বিক্রির ঘোষণা দেয়।

রাশিয়া ও ওপেকভুক্ত দেশগুলোর অনেকেই ইউরোতে তেল বিক্রির আগ্রহ প্রকাশ করে। ইউরোপ, চীন, ভারত ও জাপানসহ অন্যান্য দেশ ইউরোতে তেল ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

ফলে ডলারের চাইতে ইউরোর মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এসব দেশ ডলারের পরিবর্তে ইউরো রিজার্ভ গড়ে তুলেছে। তাই বাড়ছে ইউরোর মূল্য।

সম্প্রতি চীন ডলারের বদলে স্বর্ণ মজুদ গড়ে তুলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হিসেবে ডলারকে পরিত্যাগ করার মানসিকতা থেকে সরকার এ কাজটি করছে। উল্লেখ্য বিশ্ব মন্দার প্রভাবে চীনের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর দেশটির সরকার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হিসেবে মার্কিন ডলার সংরক্ষণের অনীহা প্রকাশ করে। ২০০৯ সালের মে মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনেও চায়না বিশ্বের দেশগুলোকে রিজার্ভ হিসেবে ডলারের উপর নির্ভরতা কমাতে আহ্বান জানায়।

তাই ডলার ক্রমশ পরিত্যক্ত হচ্ছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহায়ন ব্যবসার আকস্মিক পতন ঘটে। ঘটনাটা এ রকম–

এশিয়ার দেশগুলো থেকে তহবিল সরবরাহ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করে। এই বিপুল পরিমাণ তহবিল কোথায় বিনিয়োগ হবে? ২০০২ সালের প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অত্যধিক ঘাটতি ব্যয় বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আসা তহবিল যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের ঘাটতি ব্যয় মেটাতে বিভিন্ন খাতে অর্থায়ন করে। তাতে লাভের আশায় মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়া থেকে তহবিল প্রবাহ যুক্তরাষ্ট্রে আরও বেড়ে গেল। তখন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঘাটতি ব্যয় কমে গেলো। তাছাড়া তাদের একমাত্র পথ খোলা ছিলো গৃহায়ন শিল্পে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা। ফলশ্রুতিতে ক্রেডিট কার্ড এর দায় বাড়াতে, সহজে গাড়ি ঋণ সরবরাহ, ছাত্র ঋণ বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি গৃহায়ন ঋণ বৃদ্ধিতে ঐ আগত তহবিল মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

এমতাবস্থায় দু'টো বিষয় ঘটে।

প্রথমত: মর্টগেজের বিনিময়ে গৃহায়ন ঋণ পাওয়া সহজ হয়। দ্বিতীয়ত: এই ঋণ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে নির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অধিক হারে বাড়ি তৈরী করে। ফলে নির্মাণ ব্যয় এবং নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বাড়তে থাকলো। গৃহ এবং ফ্ল্যাট বাড়ির মূল্য অতীতের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে গেলো। বাড়ির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক মানুষ বাড়ি ক্রয় করতে উদ্বিগ্ন হয় পড়লো। ফলে নির্মাণ শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বাড়ির মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছল। নির্মাণ খাত সর্বোচ্চ পর্যায়ে অগ্রাধিকার পেল। গৃহনির্মাণ শিল্প খাতে ঋণ সরবরাহ সর্বোচ্চে পৌছল।

তাই আমেরিকানরা দেখতে পেলো যে, বাড়ির মূল্য যতই বৃদ্ধি হচ্ছে গৃহ ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করাও সম্ভব হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে দুটি বড় প্রতিষ্ঠান কাজ করে। একটি ফেনি মা (Fannie Mae) অন্যটি ফ্রেডি মেক (Freddie Mac)। প্রতিষ্ঠান দুটি সরকারের সংস্থা হিসেবে গৃহায়ন শিল্পে তহবিল সংগ্রহ এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক খাতের সংস্কারের অংশ হিসেবে এ সংস্থা দুটিকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হয়।

উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি দু'ভাবে কাজ করে। প্রথমত: তারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের কাছ থেকে জামানত ক্রয় করে। পরে ঐ জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ও ব্যাংকগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন করে এবং ব্যাংকগুলোকে অধিক ঋণ সরবরাহের উপযোগী করে তোলে। দ্বিতীয়ত: তারা জামানতের নিশ্চয়তা

প্রদান করে, যাতে ঋণ সরবরাহকারী ব্যাংকগুলো কোন ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। বীমা প্রতিষ্ঠানকে জামানতের উপর বীমা প্রিমিয়াম প্রদান করে, যাতে মন্দা ঋণের ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব হয়। এ ধরনের যৌথ ঝুঁকি নিম্ন সুদের হারে জনগণকে বাড়ি ক্রয়ে ঋণ সরবরাহ করতে সহজ উপায় অবলম্বন করার সুযোগ করে দেয়।

এ দুটো সংস্থা মূলধন বাজার (Capital Market) থেকে ঋণ গ্রহণ করে অর্থ সংগ্রহ করে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব ভাণ্ডারের বরাত দিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুকূলে নিরাপদ বিনিয়োগের নিশ্চয়তা দিয়ে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এ ধরনের বিকল্প অর্থ প্রবাহ যুক্তরাষ্ট্রের জামানত বাজারে বৈদেশিক তহবিল বৃদ্ধি পায় এবং এই অতিরিক্ত অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের গৃহায়ন শিল্পে সরাসরি বিনিয়োগ হয়।

ফেনি (Fennie) এবং ফ্রেডি (Freddie) এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত এই গৃহায়ন ঋণকে সর্বোত্তম (Prime) জামানত বলা হয়। কেননা এ সংস্থা দুটি ঋণের আকার, ঋণ গ্রহীতার আয়ের সম্পর্কের সাথে ঋণের সামঞ্জস্য, সহনীয় পর্যায়ের ক্রয়মূল্য, বীমা দাবি এবং নির্মাণ শিল্পের সাথে জড়িত অন্যান্য কারিগরি নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে ঋণের মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং সুবিবেচনা করে ঋণ সরবরাহ করে থাকে।

বিদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ঋণ সরবরাহ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রদানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন অনুভব করলো, যা যুক্তরাষ্ট্রের গৃহায়ন বাজারে "Sub-Prime" জামানত হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই Sub-Prime Mortgage Market-এ ঐ বিদেশী ঋণ সরবরাহ করা হয় যা ফেনি এবং ফ্রেডি সংস্থা দুটির শর্ত পূরণ করেনি। তাই এ ঋণ সাধারণভাবে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছড়াা এ জামানত ঋণ উপরোল্লেখিত প্রতিষ্ঠান দুটির মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়নি।

ভিন্ন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে Sub-Prime জামানত একত্রে সংগ্রহ করা হয় এবং একটি জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সমস্ত গ্রাহক অর্থনৈতিক দ্রব্যাদি ক্রয় করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের উচ্চ বা নিম্ন ঝুঁকিতে অর্থনৈতিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করার আর্থিক দলিলাদির আবির্ভাব ঘটে। অধিক ঝুঁকিতে অধিক লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। আর এভাবেই Sub-Prime জামানতকে মূখ্য জামানত ধরে নিয়ে পুনঃঅর্থায়ন করা হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে ঋণ দেয়ার মতো পর্যাপ্ত তহবিল ছিলো। তারা ব্যাংকগুলোকে তহবিল সরবরাহ করে। যার ফলে ক্রেতাকে বাড়ি ক্রয় করতে এবং গৃহায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন বাড়ি তৈরী করতে ঋণ সরবরাহ করা সহজ হয়। সুদের নিম্ন হারের কারণে প্রত্যেকে একের অধিক বাড়ি ক্রয় করায় আগ্রহী হয়ে পড়ে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে। ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারী, বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণসহ সকলে পরিতৃপ্ত হলো।

এক সময় উপরোক্ত গৃহায়ন ঋণ অতিরিক্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং এই পর্যাপ্ত গৃহায়ন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। ব্যাপক জালিয়াতি সংঘটিত হলো। দায়িত্বশীল ব্যাংকগুলো তাদের মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করলো যারা সন্দেহজনিত ঋণ সরবরাহ করেছিলো। অনেক নিম্ন মধ্যবিত্ত আমেরিকানরা গৃহঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে গভীর সংকটে পড়লো এবং নানা সমস্যার সম্মুখীন হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে প্রথম বারের মতো বাড়ির মালিক হলো এবং সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে নিজেদের গর্বিত বোধ করলো।

গৃহের মূল্য, গৃহের চাহিদা, নতুন বাড়ি নির্মাণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদান এবং মুনাফাসহ সবকিছুই ঠিকমত চলছিল। এ ধরনের গৃহঋণ আমেরিকানদের গাড়ি ক্রয় করতে, বাচ্চাদের ব্যয় বহুল স্কুল-কলেজে পাঠাতে, অবসর কাটাতে, বড় স্ক্রিনের টিভি ক্রয় করতে সামর্থ্যবান করে তোলে। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাঋণ কলেজের যাবতীয় কার্যাদির ব্যয় মেটাতে ব্যবহৃত হলো। কলেজ শিক্ষায় অর্থায়নের চাহিদা বৃদ্ধি পেলো। কলেজগুলো তাদের পর্যাপ্ত চাহিদার কথা বিবেচনা করে খরচ বাড়িয়ে দেয়। ছাত্ররা অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রঋণ সংগ্রহ করে এবং তা পুনঃঅর্থায়ন করে। যুক্তরাষ্ট্রসরকার এই জাতীয় ঋণের বিপরীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চয়তা প্রদান করে। কলেজে-ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অতীতের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। কলেজগুলো পর্যাপ্ত আয় করে। ছাত্রদের জন্য অধিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে এবং শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করে। স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ঋণের দায় পরিশোধ করার চিন্তা মাথায় রেখেই ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করতে আরও অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে।

ঋণের পরিমাণে বেড়েই চললো এবং যুক্তরাষ্ট্রে গৃহঋণের পরিমাণ আশংকাজনক হারে বেড়ে গেলো। বাড়ির মূল্য কল্পনাপ্রসূত মনে হলো যখন বাড়ির মালিকদের উপার্জন ক্ষমতার সাথে বাড়ির মূল্য সমম্বয় করা হলো। অনবরত বাড়ির মূল্য বৃদ্ধি এ বিস্ময়কর পরিস্থিতিকে আরও প্রলম্বিত করলো।

২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কল্পিত সুখস্বর্গে ধ্বস নামতে শুরু করে এবং এখন অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মর্টগেজ বাজারে আশংকাজনক ভাবে সুদের হার বেড়ে গেলো। হঠাৎ করে দায়ের পরিমাণ বেড়ে গেলো। গৃহায়ন বাজারের উর্ধ্ব মূল্য হঠাৎ থেমে গেলো এবং দ্রুত গৃহঋণের অর্থায়নের সংকটের আশংকা সৃষ্টি হলো। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে কিছুটা মন্দার প্রভাব দেখা দিলো। এই প্রভাব আরও জটিল আকার ধারণ করলো যখন অনেক লোক চাকুরি হারালো এবং বোনাস ও ওভার টাইমের পরিমাণ হ্রাস করা হলো। নাটকীয়ভাবে খাদ্য দ্রব্য এবং জ্বালানী তেলের দাম বেড়ে গেলো। জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেলো। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি উচ্চ হারে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করলো।

আয়ের সাথে ব্যয়ের সংযোগ না থাকায় এবং গৃহনির্মাণ ঋণ যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বল অর্থনীতিকে আরও স্থবির করে দিলো এবং গৃহ ঋণের বাজার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। ফেডারেল রিজার্ভ নিম্ন হার সুদে দ্রুত সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে এগিয়ে আসলো। যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নগামী মূলধন বাজারের উপর এর প্রভাব পড়লো। ব্যাংকের সুদের হার না কমানোর ফলে এর বিপরীতে দ্রব্য মূল্যের দাম আরও বেড়ে গেলো। যুক্তরাষ্ট্রে সংকুচিত মূলধন সরবরাহ ডলারের মূল্যকে কমিয়ে দিলো। ফলে আমদানী হ্রাস পেলো। সারা বিশ্বে তেলের দাম বেড়ে গেলো এবং যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বেড়ে গেলো। আভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল ডলার যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনকারীদের রপ্তানিতে সহযোগিতা করলো। কিন্তু জ্বালানী তেলের উর্ধ্বগতি যুক্তরাষ্ট্রের গৃহনির্মাণ শিল্প ও দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিঘ্ন ঘটায়।

গৃহায়ন খাত, বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ এবং শিল্পের যন্ত্রাংশ ক্রয়ের খাতে হঠাৎ বিনিয়োগ কমে গেলো। বেসরকারী ভোগ ব্যয় কমে যাওয়ার কারণে রপ্তানি বেড়ে গেলো। এর পরবর্তী ফলস্বরূপ আমেরিকার অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দিলো।

ফলে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Lehman Brothers

নামক ১৫৮ বছরের পুরাতন বৃহৎ একটি ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি ব্যাংক বন্ধের সর্ববৃহৎ ঘটনা। গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮ম বৃহত্তম ব্যাংক (Georgian Bamk) বন্ধ হয়ে গেছে। এটি জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ব্যাংক বন্ধের তালিকায় ১৯তম। এটি সহ ২০০৯ সালে ৯৮টি মার্কিন ব্যাংক ও ১৪টি Credit Union বন্ধ হয়ে গেছে। ২০০৮ সালে মোট ৪০টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছিল। চলতি বছর প্রতি মাসে গড়ে ১০টি ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে।

ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে মন্দা বা Financial Tsunami।

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এমনকি বিশ্বব্যাংক এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট জোয়েলিক।

এমতাবস্থায় বাড়ছে মানুষের কষ্ট।

নিম্নের প্রথম চিত্রে আমেরিকানদের 'খুব বেশি উদ্বেগ' ও দ্বিতীয় চিত্রে 'জীবনে সবচেয়ে কম তৃপ্তি' পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র - ২:

চিত্র - ৩:

স্বপ্নের দেশ আকেরিকায় চাকরির বাজার এখন প্রচণ্ড মন্দা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে যে দক্ষ জনশক্তিরও প্রয়োজন হচ্ছে না মার্কিন সংস্থাগুলোর। ফলে পূরণ হচ্ছে না জনপ্রিয় 'এইচ ওয়ান বি' ভিসার কোটা।

২০০৯ সালে ৬৫ হাজার 'এইচ ওয়ান বি' ভিসা দেওয়ার কথা থাকলেও ১০ দিনে আবেদনপত্র জমা পড়েছে মাত্র ৪২ হাজার। অথচ গত বছর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ কোটা পূরণ হয়ে গিয়েছিল। এর আগের বছরগুলোতে 'এইচ ওয়ান বি' ভিসার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বিভিন্ন দেশের মানুষ।

সাধারণত চিকিৎসক ও প্রকৌশলীরাই 'এইচ ওয়ান বি' ভিসা পান। এ ভিসার ম্যাধমে যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করার অনুমতি দেওয়া হয়। মেয়াদ বাড়ানো সহজ বলে অনেকে এ ভিসাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গণ্য করেন। ভারতসহ এশিয়ার অনেক দেশের মানুষই এ ভিসার সুবিধা নিয়ে থাকে। আর মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ জনশক্তি নিয়োগে সুবিধা পায়। কিন্তু অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও বিদেশ থেকে কর্মী নিতে আগ্রহী

নয়। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ভিসার চাহিদা কমার মাধ্যমে একই সঙ্গে বিদেশী কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অনীহা ও এমন কর্মী নিয়োগে কোম্পানীগুলোর অনিচ্ছার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। সংবাদপত্রগুলো এ ঘটনাকে অর্থনৈতিক মন্দার সুস্পষ্ট ফল হিসেবে মনে করছে।

সত্তর বছরের মধ্যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্ক লোকেরাও চাকরির খোঁজে নেমেছে। একটি বেসরকারী জরিপ থেকে এমন তথ্যই বেরিয়ে এসেছে। 'এক্সপেরিয়েন্স ওয়ার্ক' নামের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জরিপের ফলাফলটি ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায় দুই হাজার নিম্ন আয়ের লোকের মধ্যে শতকরা ৪৬ জনের বয়স ৫৫ বছরের বেশি। এদের অর্ধেক এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি খুঁজছেন। 'এক্সপেরিয়েন্স ওয়ার্কের' প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী কর্মকর্তা সিনথিয়া মেলজার বলেছেন, এ লোকগুলো তাদের কাজ করার বয়স অনেক পেছনে ফেলে এসেছেন।

তিনি আরও বলেন, এদের মধ্যে অনেকের বয়সই ৬০/৭০ বছর এবং তারও বেশি। তবুও এরা মরিয়া হয়ে কাজের খোঁজে নেমেছে যাতে করে মাথার উপর ছাদ থাকে এবং টেবিলে খাবার পায়। জরিপ অনুযায়ী অনেকেই তাদের ৬০তম জন্মদিন পার করার পর আর কাজ করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তবে তাদের সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের এক তৃতীয়াংশ কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর আবার কাজ খুঁজছেন। জরিপে ৭৬ বা তার বেশি বয়সের অংশগ্রহণকারীদের ৯০ ভাগই আগামী ৫ বছর কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছে।

শুধু কি আমেরিকানরা? ডলার নিয়ে আমরাও সংকটে আছি। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে বাংলাদেশে আমদানী কমে যাওয়াতে ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ডলারের রিজার্ভ বেড়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাতে থাকা বাড়তি ডলার বিক্রি করতে না পেরে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারস্থ হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৯ সালের প্রথম দশ মাস বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে ৮০ কোটি ডলার ক্রয় করেছে।

দেশে ডলারের চাহিদা কমে যাওয়ায় বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ। গত ৬ মে ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ছিলো রেকর্ড পরিমাণ ৬৫২ কোটি ডলার। অবস্থা সামাল দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ডলার ধারণ ক্ষমতা Net Open Position (NOP) ইউএস ডলার ৪৩২ মিলিয়ন থেকে ৫১৭ মিলিয়ন ডলারে

বৃদ্ধি করেছে। এটা দ্বিতীয় দফা বৃদ্ধি। এর আগে মাত্র ৫ মাস আগে NOP ইউএস ডলার ১৯০ মিলিয়ন থেকে ৪৩২ মিলিয়ন ডলারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে ডলার কিনতে হবে না কেন্দ্রীয় ব্যাংককে। তাতে দেশীয় বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল থাকবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ ৪৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে ডলারের স্তূপ ভারী হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ। তাই চীনের মতো বাংলাদেশও "ডলারের বদলে স্বর্ণ" রিজার্ভ গড়ে তোলা যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার।

তা ছাড়া নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ বিশ্ব মন্দা মোকাবেলায় কার্যকর হতে পারে–

১. পণ্য বিক্রি বা লীজ দেওয়ার পূর্বে বিক্রেতাকে পণ্যের মালিক হতে হবে এবং পণ্য বা সম্পদ তার দখলে থাকতে হবে। এ ব্যবস্থার ফলে মুনাফা অর্জনের জন্য ঝুঁকিতে বিক্রেতার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয়। সংক্ষেপে ক্রয় বিক্রয় অর্থাৎ বিনা ঝুঁকিতে বা নাম মাত্র ঝুঁকিতে ক্রয় বিক্রয় রহিত হয়। এর ফলে হঠাৎ পণ্যমূল্য পড়ে যেতে পারে না বলে মন্দার সৃষ্টি হতে পারে না।

২. লেনদেন হতে হবে ব্যবসায়িক যেখানে পণ্য ও সেবা ডেলিভারী প্রদানে ও গ্রহণে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকতে হবে। এ শর্তের ফলে ব্যবসায়ীগণ ঝুঁকি মূল্যায়নে অধিকতর সচেতন হবেন এবং ফটকা কারবার প্রতিরোধ করতে উৎসাহ বোধ করবেন।

৩. ঋণ বিক্রয় করা যাবে না এবং ঋণদাতা অবশ্যই ঋণের ঝুঁকি বহন করবে। ঝুঁকি (Risk) বিক্রয় করা যাবে না। ফলে লেনদেনের ধারবাহিকতায় প্রথম ব্যক্তি ব্যবসায়িক দৃশ্যপট থেকে উধাও বা আড়াল হবে না। তাই পরবর্তী ক্রেতাগণ প্রতারিত হবেন না বলে মন্দা দেখা দিবে না।

৪. বিক্রিত বা লীজকৃত সম্পদ অবশ্যই বাস্তব হতে হবে। কাল্পনিক বা অস্তিত্বহীন (Imaginary or notional) সম্পদ বিক্রি বা লীজ দেওয়া যাবে না। এ ব্যবস্থার ফলে Derivative-এর মতো ফটকা লেনদেন রহিত হবে, যার ভিত্তি হচ্ছে অর্থহীন অর্থের খেলা (zero sum game) যখানে এক পক্ষের ক্ষতি অপর পক্ষের লাভ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৪

টাকার কষ্ট দূর

টাকার কষ্ট দূর হবে কেমনে?

টাকার কষ্ট দূর করতে হলে টাকার সদ্ব্যবহার করতে হবে। উৎপাদন ও উৎপাদনশীল সেবার সাথে টাকার সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

কেননা টাকা বিনিময়ের মাধ্যম। টাকার রয়েছে ক্রয়ক্ষমতা। এ ক্রয়ক্ষমতা আছে বলে শূন্য থেকে যদি টাকার সৃষ্টি হয় এবং ঋণ হিসেবে টাকা ক্রয়-বিক্রয় হয়; আর যদি অর্থ বাজারে 'ঋণের ঝুঁকি' ক্রয়-বিক্রয় হয়; তবে টাকার কষ্ট বাড়ে।

অনৈতিক খরচ ও ভোগ বিলাসিতায় টাকা খরচ বন্ধ করলে টাকার কষ্ট দূর হতে পারে।

সুদমুক্ত লেনদেন টাকাকে গন্ধমুক্ত করতে পারে। তাতে টাকার কষ্টও দূর হতে পারে।

টাকা দিয়ে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রেখে যদি উদ্যোক্তার উন্নয়ন ঘটানো যায় তবে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। টাকার কষ্ট দূর হবে।

এ লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করতে পারে।

পদ্ধতি-১ : বাই-মুয়াজ্জাল

এটি একটি পণ্য বিক্রয় চুক্তি যেখানে মূল্য পরিশোধ পরে করতে হয়।

মনে করি, করিম কাপড়ের ব্যবসা করতে চায়। সে ব্যাংককে কথাটি জানায়। ব্যাংক নির্ধারিত মূল্যে কাপড় ক্রয় করবে। পরে ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফা ধার্য করে করিমের নিকট বিক্রয় করবে। করিম পণ্যটি গ্রহণ করবে এবং পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করবে। ব্যাংক কর্তৃক পণ্যটির ক্রয়মূল্য ও ধার্যকৃত মুনাফা সম্পর্কে করিম জানতেও পারে; নাও জানতে পারে। তবে পণ্যটি গ্রহণ করা ও মূল্য পরিশোধে তার রাজি হওয়াটাই আসল কথা।

বাই-মুয়াজ্জাল এর কতিপয় আর্থিক কাঠামো রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো–

আর্থিক কাঠামো :

বাই মুয়াজ্জালে দুটি কিস্তিতে 'বিক্রয় চুক্তি' হয়ে থাকে। প্রথম চুক্তি হয়ে থাকে পণ্য বিক্রেতা ও ব্যাংকের মধ্যে এবং দ্বিতীয় চুক্তি হয়ে থাকে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে। নিম্নে এরূপ অর্থায়ন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো দেখান হলো।

বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি-১ :

১. গ্রাহক ক্রয় করতে ইচ্ছুক এরূপ পণ্য ঠিক করে বিক্রেতার কাছ থেকে ঐ পণ্য সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে।

২. গ্রাহক ব্যাংককে অনুরোধ করে পণ্যটি বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে তার নিকট বিক্রয় করতে।

৩. ব্যাংক গ্রাহক প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাজারে বিক্রেতাকে পণ্যটির মূল্য শোধ করে পণ্যটি ক্রয় করে।

৪. বিক্রেতা পণ্যটির মালিকানা ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করে।

৫. ব্যাংক ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা যোগ করে পণ্যটি গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রয় করে। ফলে পণ্যটির মালিকানা গ্রাহকের নিকট চলে যায়।

৬. গ্রাহক পণ্যটি গ্রহণ করে এবং ব্যাংকের নিকট ঋণী থাকে। পরে কিস্তিতে ঋণ শোধ করে।
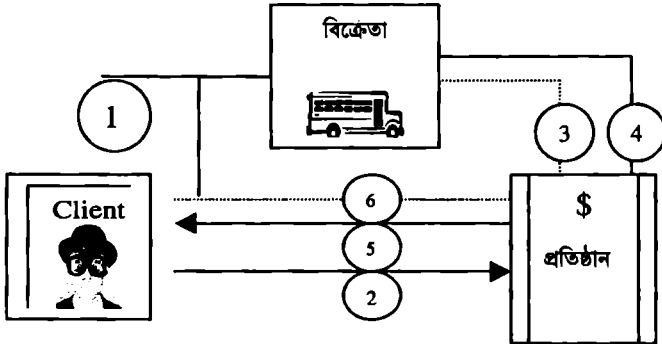
Dotted line indicates flow of funds

যে ক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষে সরাসরি বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহককে তার 'এজেন্ট' নিয়োগ করে ঐ পণ্য বাজার থেকে কিনতে পারে। তাই পণ্য ক্রয়ের প্রথম চুক্তি হয়ে থাকে ব্যাংকের গ্রাহক ও বাজারে পণ্য বিক্রেতার মধ্যে। এরূপ পরিবর্তিত অবস্থায় বাই-মুয়াজ্জালের ধাপগুলো নিম্নরূপ–

বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি-২ :

১. ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হয় যে ব্যাংক লাভে পণ্য বিক্রি করবে এবং গ্রাহক তা ক্রয় করবে। কিস্তিতে ঋণ শোধ করবে।

২. ব্যাংক গ্রাহককে এজেন্ট নিয়োগ করবে।

৩. গ্রাহক বাজারে পণ্য বিক্রেতা, পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি ঠিক করে লিখিতভাবে ব্যাংককে জানায়।

৪. বাজারে বিক্রেতা ব্যাংক এর এজেন্টের নিকট পণ্য সরবরাহ করবে এবং ব্যাংক তা তদারক করবে।

৫. ব্যাংক বাজারে পণ্য বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করবে।

৬. এজেন্ট হিসেবে গ্রাহকের চুক্তি ব্যাংকের সাথে সমাপ্ত হয়। ব্যাংক গ্রাহকের নিকট পণ্য বিক্রি করল পরস্পরের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত লাভে এবং গ্রাহক এ পর্যায়ে পণ্যটি গ্রহণ করে ব্যাংক এর নিকট ঋণী থাকবে।

৭. গ্রাহক কিস্তিতে ঋণ শোধ করবে।
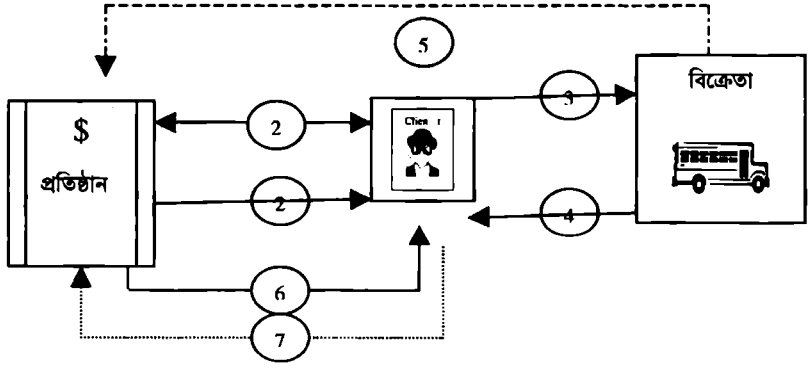
Dotted line indicates flow of funds

উপরে বর্ণিত বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতির মধ্যে 'গ্রাহক এজেন্ট' হিসেবে পণ্য ক্রয়ের চুক্তি করার রকমটি উত্তম বলে বিবেচিত। কেননা গ্রাহক তার ইচ্ছা অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করতে পারে। ফলে লোকসানের ঝুঁকি কমে যায়। ব্যাংকের জন্য এ রকম বাই-মুয়াজ্জালের অধীনে লেনদেনও সহজ। তাই বিনিয়োগ ঝুঁকি কম থাকে। এরূপ বাই-মুয়াজ্জালে 'গ্রাহকের সন্তুষ্টি' বিধান করা যায় বলে ব্যাংকের ব্যবসায়িক সফলতা বেশি হতে পারে।

বাই-মুয়াজ্জালের শর্তাবলী :

বাই-মুয়াজ্জালের পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হয়, তবে সুদ ও মুনাফার পার্থক্য বুঝা যাবে না। তাই ইসলামী শরীয়া'হ বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করেছে, যাতে তা সুদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, আরও কিছু শর্ত রয়েছে যা এ পদ্ধতিকে 'ঘারার' থেকে মুক্ত রাখে।

এ ধরনের শর্তাবলী অনেক। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ঝুঁকি এবং আয় :

ইসলামী শরীয়তের 'দায়ের সাথে আয়' সম্পৃক্ত বিধান অনুসারে ব্যাংককে অবশ্যই কিছু না ঝুঁকি বহন করতে হবে। যেমন, পণ্যের 'মূল্য ঝুঁকি' বা 'পণ্য নষ্ট' হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি ইত্যাদি।

ঝুঁকি বহন না করলে ক্রয়-বিক্রয়ের আয় হালাল হবে না।

মনে রাখতে হবে যে, সুদী প্রতিষ্ঠানও কিন্তু ঋণ অনাদায়ের ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু আয় হালাল হওয়ার জন্য তা ইসলামী শরীয়তে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং আয় হালাল হওয়ার জন্য এবং সুদ সম্পর্কিত সকল সন্দেহের উর্ধ্বে থাকার জন্য উপরে বর্ণিত বাই-মুয়াজ্জালের ধাপগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

বিক্রির সময় পণ্য অবশ্যই বিক্রেতার দখলে থাকতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের নিকট পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যটি অবশ্যই তার দখলে থাকতে হবে। তাহলে পণ্যের মূল্য ঝুঁকি ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বহন হয়ে যায়।

এসব ঝুঁকি বহন করার ফলে বিক্রিত পণ্যের মুনাফা হালাল হয়ে থাকে এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব ঝুঁকি যদি ক্ষুদ্রতম সময়ের জন্যও হয়ে থাকে,

তাতে দোষের কিছু নেই। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ ঝুঁকির কারণেই পণ্য বিক্রয়ের মুনাফা সুদের মতো হয় না।

প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ওয়াদা এক নয়। বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা তার গ্রাহক পণ্য ক্রয়ের ওয়াদা করে যা তার জন্য নৈতিক দায় দায়িত্বের সৃষ্টি করে। তাই পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ওয়াদা কোন অবস্থাতেই ভঙ্গ করা যাবে না। তাছাড়া হারাম কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

মূল্য নির্ধারণ :

একটি পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে- পণ্যটি সম্পর্কে জানা, পণ্যটির নির্ধারিত মূল্য এবং মূল্য পরিশোধের নিয়ম অবহিত হওয়া।

বাই-মুয়াজ্জাল চুক্তি করার সময় পণ্য মূল্য নির্ধারিত হয় এবং মূল্য পরিশোধের নিয়মও কিস্তি নির্ধারণের ফলে ঠিক হয়ে থাকে। ফলে চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মাঝে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কোন 'ঘারার' বা অনিশ্চয়তা থাকে না যা ভবিষ্যতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে।

বাই-মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারিত হয় প্রচলিত সুদের হারের মতোই। যেহেতু একই সমাজে সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক পাশাপাশি কাজ করে সেহেতু বিষয়টি একই রকম মনে হলেও ইসলামী শরীয়তে বাই-মুয়াজ্জালকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ইজারা (লীজিং) :

কোন সম্পদ ভাড়া করাকে ইজারা বলে। যেমন- বাড়ি, গাড়ি, সেচ পাম্প ইত্যাদি ইজারা নেয়া যায়।

ব্যাংক ইজারাকৃত সম্পদের মালিক থাকে। ইজারা গ্রহীতা শুধুমাত্র সম্পদটির ব্যবহারিক সুবিধা পেয়ে থাকে। ইজারার মেয়াদ শেষে সম্পদটি মালিকের (ব্যাংকের) নিকট ফেরৎ যাবে। তবে সম্পদটি ইজারা প্রদান করার জন্য ব্যাংক ইজারা গ্রহীতার কাছ থেকে কিস্তিতে নগদ টাকা আদায় করতে পারে।

প্রতিটি কিস্তিতে সম্পদের মূল্য ও ভাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। মেয়াদ শেষে ইজারা দেয়া সম্পদ গ্রাহকের নিকট নাম মাত্র মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। ইজারাকালীন সময়ে সম্পদের চলতি খরচ যদি কিছু থাকে, তবে তা ইজারা গ্রহীতাকে বহন করতে হয়।

যেহতু মেয়াদ শেষে নাম মাত্র মূল্যে সম্পদটি ইজারা গ্রহীতার নিকট বিক্রির শর্ত থাকে সেহেতু সম্পদটির উত্তম ব্যবহার ইজারা গ্রহীতা করে থাকেন। তাই চলিত খরচ তেমন একটা হয় না।

ইজারা চুক্তি ও বিক্রয় চুক্তি আলাদা হতে হবে। ইজারা শেষে বিক্রয় চুক্তি হওয়া উত্তম।

কোন কোন সম্পদ ব্যাংক ও গ্রাহক শেয়ারে ক্রয় করতে পারে এবং ব্যাংকের অংশ গ্রাহকের নিকট ইজারা প্রদান করতে পারে। মেয়াদ শেষে গ্রাহক সম্পদের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যায়।

ইজারাকালীন সময়ে সম্পদের উত্তম ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য এরূপ ইজারা পদ্ধতি ব্যাংকের জন্য উত্তম।

মুদারাবা

ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাই-মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে পণ্যক্রয়-বিক্রয়ে বাস্তব কিছু সমস্যা হয়। তাই নগদ টাকার লেন-দেনই উত্তম।

ইসলামী শরীয়া'হ মোতাবেক মুদারাবা পদ্ধতিতে গ্রাহককে নগদ টাকা দেয়া যেতে পারে। তাতে কোন সুদ হবে না।

নিম্নে মুদারাবা পদ্ধতি আলোচনা করা হলো-

গ্রাহকের পছন্দসই ব্যবসায়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে নগদ অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। নিজেদের পছন্দসই ব্যবসায়ে অথবা গ্রাহক এবং ব্যাংক উভয়ের পছন্দসই ব্যবসায়েও মুদারাবা নীতিতে অর্থ বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে ব্যাংক হলো 'সাহেব আল্ মাল' বা পুঁজির মালিক এবং গ্রাহক হলো 'মুদারিব' বা উদ্যোক্তা যিনি তাঁর শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করবেন। মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। লোকসান হলে ব্যাংক তা সম্পূর্ণ বহন করবে। উদ্যোক্তার পরিশ্রম বৃথা যাবে। সে কোন আর্থিক ক্ষতি বহন করবে না।

মুদারাবার ক্ষেত্রে মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত নয়। ব্যবসায় শেষে মুনাফার পরিমাণ জানা যায়। তবে ব্যবসায়ের শুরুতে মুনাফার পরিমাণ কি হতে পারে তা অনুমান করা যায়। প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে মুদারিব সচেষ্ট থাকেন। তাই প্রকৃত মুনাফা প্রত্যাশিত মুনাফা হতে একটু কম বেশি হয়ে থাকে। তাই মুদারাবা পদ্ধতিতে প্রাক্কলিত মুনাফা অর্থাৎ প্রত্যাশিত মুনাফা নির্ণয় করা যায়।

প্রকৃত মুনাফার সাথে সমন্বয়সাধন করে লাভ লোকসান হিসাব করা যায়। প্রাক্কলিত মুনাফা কম করে নির্ধারণ করাই উত্তম।

এসব করতে হলে ব্যাংকের ফিল্ড অফিসার ও গ্রাহকের মধ্যে ব্যবসায় সংক্রান্ত সঠিক তথ্য জানা থাকতে হবে। চূড়ান্ত মুনাফা সমন্বয় হতে হবে ব্যাংকের একক সিদ্ধান্তে।

তবে তা ব্যাংকের প্রচলিত মুনাফার হারের চেয়ে বেশি হবে না। তাতে গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগ হলো জামানত মুক্ত। তবে গ্রুপভিত্তিক। এ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন সাপ্তাহিক কিস্তি শোধ, গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে ব্যাক্তিগত সঞ্চয়, অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাপনা এবং গ্রুপ শৃঙ্খলা ও নিয়ম নীতি মেনে চলা।

সাধারণত: ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ব্যবসায় কম ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু লাভ বেশি। কারণ ছোট সুন্দর এবং বাস্তব। তা ছাড়া 'ক্রমহ্রাসমান নীতি' ক্ষুদ্র ঋণের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যকর নহে।

অতএব, ব্যাংক মুদারাবা নীতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নগদ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ ব্যাংক থেকে নগদ অর্থ পেতে পারেন।

শুরুতে ব্যাংক মুদারাবাভিত্তিক ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ মালিক থাকে। তাই পূর্ব নির্ধারিত প্রভিশনাল মুনাফার পুরাটাই ব্যাংকের। গ্রাহক সাপ্তাহিক কিস্তি শোধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করেন মাত্র।

এভাবে গ্রাহকের নিকট সাপ্তাহিক কিস্তিতে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ব্যাংক প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সাপ্তাহিক ১৫০০ (পনের শত) টাকা মুনাফা অর্জন করেন। ব্যাংক তাকে মুদারাবা নীতিতে ১৫০০০ (পনের হাজার) টাকা বিনিয়োগ দিল ৪৫টি সাপ্তাহিক কিস্তিতে শোধ করতে হবে- এই শর্তে।

ফলে প্রত্যেক সাপ্তাহিক কিস্তি ৩৩৩ (তিনশত তেত্রিশ) টাকা শোধ করার মাধ্যমে ব্যাংকের নিকট থেকে ব্যবসায়ের শেয়ার সে ক্রয় করে। প্রতি শেয়ারের মুনাফা হচ্ছে ৩৩ (তেত্রিশ) টাকা (১৫০০/৪৫)।

ব্যাংক ও গ্রাহক এই মর্মে চুক্তি করেন যে, মুনাফার ১০% পাবে ব্যাংক এবং ৯০% পাবে গ্রাহক।

প্রথম সপ্তাহে সম্পূর্ণ শেয়ার যেহেতু ব্যাংকের মালিকানায় থাকে সেহেতু ব্যাংকটি সাপ্তাহিক মুনাফার ১৫০০ (পনের শত) টাকার ১০% হারে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা পাবে।

গ্রাহক ৯০% হারে পাবে ১৩৫০ (তেরশত পঞ্চাশ) টাকা। এই ১৩৫০ (তেরশত পঞ্চাশ) টাকা থেকে গ্রাহক একটি শেয়ার ক্রয় করার জন্য ৩৩৩ (তিনশত তেত্রিশ) টাকা ব্যয় করবে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে ব্যাংক সাপ্তাহিক মুনাফা ১৫০০ (পনের শত) টাকার ১০%*৪৪/৪৫ পাবে যেহেতু এখন ৪৫ টি শেয়ারের মধ্যে মাত্র ৪৪ টি শেয়ার তার নিকট রয়েছে।

সুতরাং ব্যাংক পাবে ১৪৭ (একশত সাতচল্লিশ) টাকা। বাকি (১৫০০ - ১৪৭) = ১৩৫৩ টাকা পাবে গ্রাহক।

অন্যভাবে বলা যায়, গ্রাহক পায় (০.৯০*১৪৬৭ + ৩৩)। এখানে ১৪৬৭ টাকা মুনাফা ব্যাংকের সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। কিন্তু ৩৩ (তেত্রিশ) টাকা হচ্ছে প্রতি শেয়ার এর মুনাফা।

মনে রাখতে হবে, গত সপ্তাহে খরিদকৃত শেয়ার গ্রাহকের। অতএব গ্রাহকের নিজের শেয়ারের অর্জিত মুনাফা ভাগাভাগির দরকার নেই।

তবে দ্বিতীয় শেয়ার ক্রয় করার জন্য গ্রাহক অর্জিত মুনাফার ৩৩৩ (তিনশত তেত্রিশ) টাকা ব্যয় করবে।

এরূপ শেয়ার ক্রয় ৪৫তম সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

তাতে সারণী-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংক পায় মোট ৩,৪৫০ (তিন হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা এবং গ্রাহক পায় ৬৪,০৫০ (চৌষট্টি হাজার পঞ্চাশ) টাকা। গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের তালিকা সারণী-২ তে দেখানো হলো ।

সাপ্তাহিক কিস্তিতে শোধ করার ক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা প্রভিশনাল মুনাফার চাইতে কম হবে না।

সুতরাং মুদারাবা নীতি বাস্তবায়নে তেমন কোন ঝুঁকি নেই বললেই চলে।

প্রকৃত মুনাফা যদি বেশিও হয়ে থাকে তবে তাতে ব্যাংকের কোন দাবি থাকবে না।

সুতরাং সাপ্তাহিক মুনাফার পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে ব্যাংকের বিনিয়োগ

ব্যবসায়ের শেয়ার ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে, যাতে মুদারাবা নীতিকে ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থায় খাপ খাওয়ানো যায়।

মুদারাবা নীতিতে সাপ্তাহিক কিস্তির পরিমাণ কম-বেশি হবে। তাতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হবে না যদি সাপ্তাহিক কিস্তির তালিকা উভয়ের স্বাক্ষরসহ রেজিষ্টার বই ও পাশ বইয়ের সাথে গেঁথে রাখা হয় এবং যদি এসব হিসাব অন্যান্য হিসাবের বই থেকে আলাদা করে রাখা হয়।

সারণী-১: প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের মধ্যে মুদারাবা নীতিতে মুনাফা ভাগাভাগির উদাহরণ

সপ্তাহ	মুনাফা ভাগাভাগি (টাকা)	প্রতিষ্ঠানের আয় (টাকা)	গ্রাহকের আয় (টাকা)
১	৪৫/ ৪৫*১৫০০=১৫০০	১৫০০*১০%=১৫০	১৫০০*৯০%+০=১৩৫০
২	৪৪/৪৫*১৫০০=১৪৬৭	১৪৬৭*১০%=১৪৭	১৪৬৭*৯০%+৩৩=১৩৫৩
৩	৪৩/৪৫*১৫০০=১৪৩৩	১৪৩৩*১০%=১৪৩	১৪৩৩*৯০%+৬৭=১৩৫৭
৪	৪২/৪৫*১৫০০=১৪০০	১৪০০*১০%=১৪০	১৪০০*৯০%+১০০=১৩৬০
৫	৪১/৪৫*১৫০০=১৩৬৭	১৩৬৭*১০%=১৩৭	১৩৬৭*৯০%+১৩৩=১৩৬৩
৬	৪০/৪৫*১৫৫=১৩৩৩	১৩৩৩*১০%=১৩৩	১৩৩৩*৯০%+১৬৭=১৩৬৭
৭	৩৯/৪৫*১৫০০=১৩০০	১৩০০*১০%=১৩০	১৩০০*৯০%+২০০=১৩৭০
৮	৩৮/৪৫*১৫০০=১২৬৭	১২৬৭*১০%=১২৭	১২৬৭*৯০%+২৩৩=১৩৭৩
৯	৩৭/৪৫*১৫০০=১২৩৩	১২৩৩*১০%=১২৩	১২৩৩*৯০%+২৬৭=১৩৭৭
১০	৩৬/৪৫*১৫০০=১২০০	১২০০*১০%=১২০	১২০০*৯০%+৩০০=১৩৮০
১১	৩৫/৪৫*১৫০০=১১৬৭	১১৬৭*১০%=১১৭	১১৬৭*৯০%+৩৩৩=১৩৮৩
১২	৩৪/৪৫*১৫০০=১১৩৩	১১৩৩*১০%=১১৩	১১৩৩*৯০%+৩৬৭=১৩৮৭
১৩	৩৩/৪৫*১৫০০=১১০০	১১০০*১০%=১১০	১১০০*৯০%+৪০০=১৩৯০
১৪	৩২/৪৫*১৫০০=১০৬৭	১০৬৭*১০%=১০৭	১০৬৭*৯০%+৪৩৩=১৩৯৩
১৫	৩১/৪৫*১৫০০=১০৩৩	১০৩৩*১০%=১০৩	১০৩৩*৯০%+৪৬৭=১৩৯৭
১৬	৩০/৪৫*১৫০০=১০০০	১০০০*১০%=১০০	১০০০*৯০%+৫০০=১৪০০
১৭	২৯/৪৫*১৫০০=৯৬৭	৯৬৭*১০%=৯৭	৯৬৭*৯০%=৫৩৩+১৪০৩
১৮	২৮/৪৫*১৫০০=৯৩৩	৯৩৩*১০%=৯৩	৯৩৩*৯০%+৫৬৭=১৪০৭
১৯	২৭/৪৫*১৫০০=৯০০	৯০০*১০%=৯০	৯০০*৯০%+৬০০=১৪১০
২০	২৬/৪৫*১৫০০=৮৬৭	৮৬৭*১০%=৮৭	৮৬৭*৯০%+৬৩৩=১৪১৩
২১	২৫/৪৫*১৫০০=৮৩৩	৮৩৩*১০%=৮৩	৮৩৩*৯০%+৬৬৭=১৪১৭
২২	২৪/৪৫*১৫০০=৮০০	৮০০*১০%=৮০	৮০০*৯০%+৭০০=১৪২০

সপ্তাহ	মুনাফা ভাগাভাগি (টাকা	প্রতিষ্ঠানের আয় (টাকা)	গ্রাহকের আয় (টাকা)
২৩	২৩/৪৫*১৫০০=৭৬৭	৭৬৭*১০%=৭৭	৭৬৭*৯০%+৭৩৩=১৪২৩
২৪	২২/৪৫*১৫০০=৭৩৩	৭৩৩*১০%=৭৩	৭৩৩*৯০%+৭৬৭=১৪২৭
২৫	২১/৪৫*১৫০০=৭০০	৭০০*১০%=৭০	৭০০*৯০%+৮০০=১৪৩০
২৬	২০/৪৫*১৫০০=৬৬৭	৬৬৭*১০%=৬৭	৬৬৭*৯০%+৮৩৩=১৪৩৩
২৭	১৯/৪৫*১৫০০=৬৩৩	৬৩৩*১০%=৬৩	৬৩৩*৯০%+৮৬৭=১৪৩৭
২৮	১৮/৪৫*১৫০০=৬০০	৬০০*১০%=৬০	৬০০*৯০%+৯০০=১৪৪০
২৯	১৭/৪৫*১৫০০=৫৬৭	৫৬৭*১০%=৫৭	৫৬৭*৯০%+৯৩৩৩=১৪৪৩
৩০	১৬/৪৫*১৫০০=৫৩৩	৫৩৩*১০%=৫৩	৫৩৩*৯০%+৯৬৭=১৪৪৭
৩১	১৫/৪৫*১৫০০=৫০০	৫০০*১০%=৫০	৫০০*৯০%+১০০০=১৪৫০
৩২	১৪/৪৫*১৫০০=৪৬৭	৪৬৭*১০%=৪৭	৪৬৭*৯০%+১০৩৩=১৪৫৩
৩৩	১৩/৪৫*১৫০০=৪৩৩	৪৩৩*১০%=৪৩	৪৩৩*৯০%+১০৬৭=১৪৫৭
৩৪	১২/৪৫*১৫০০=৪০০	৪০০*১০%=৪০	৪০০*৯০%+১১০০=১৪৬০
৩৫	১১/৪৫*১৫০০=৩৬৭	৩৬৭*১০%=৩৭	৩৬৭*৯০%+১১৩৩=১৪৬৩
৩৬	১০/৪৫*১৫০০=৩৩৩	৩৩৩*১০%=৩৩	৩৩৩*৯০%+১১৬৭=১৪৬৭
৩৭	৯/৪৫*১৫০০=৩০০	৩০০*১০%=৩০	৩০০*৯০%+১২০০=১৪৭০
৩৮	৮/৪৫*১৫০০=২৬৭	২৬৭*১০%=২৭	২৬৭*৯০%+১২৩৩=১৪৭৩
৩৯	৭/৪৫*১৫০০=২৩৩	২৩৩*১০%=২৩	২৩৩*৯০%+১২৬৭=১৪৭৭
৪০	৬/৪৫*১৫০০=২০০	২০০*১০%=২০	২০০*৯০%+১৩০০০=১৪৮০
৪১	৫/৪৫*১৫০০=১৬৭	১৬৭*১০%=১৭	১৬৭*৯০%+১৩৩৩৩=১৪৮৩
৪২	৪/৪৫*১৫০০=১৩৩	১৩৩*১০%=১৩	১৩৩*৯০%+১৩৬৭=১৪৮৭
৪৩	৩/৪৫*১৫০০=১০০	১০০*১০%=১০	১০০*৯০%+১৪০০=১৪৯০
৪৪	২/৪৫*১৫০০=৬৭	৬৭*১০%=৭	৬৭*৯০%+১৪৩৩=১৪৯৩
৪৫	১/৪৫*১৫০০=৩৪	৩৩*১০%=৪	৩৩*৯০%+১৪৬৭=১৪৯৬
মোট (টাকা)		৩,৪৫০	৬৪,০৫০

সারণী-২ : মুদারাবা নীতিতে গ্রাহকের কিস্তি পরিশোধের তালিকা

সপ্তাহ	শেয়ার ক্রয় (টাকা)	মুনাফা ভাগাভাগি (টাকা)	মোট পরিশোধ (টাকা)
১	৩৩৩	১৫০	৪৮৩
২	৩৩৩	১৪৭	৪৭৯
৩	৩৩৩	১৪৩	৪৭৬
৪	৩৩৩	১৪০	৪৭৩
৫	৩৩৩	১৩৭	৪৬৯
৬	৩৩৩	১৩৩	৪৬৬
৭	৩৩৩	১৩০	৪৬৩
৮	৩৩৩	১২৭	৪৫৯
৯	৩৩৩	১২৩	৪৫৬
১০	৩৩৩	১২০	৪৫৩
১১	৩৩৩	১১৭	৪৫০
১২	৩৩৩	১১৩	৪৪৬
১৩	৩৩৩	১১০	৪৪৩
১৪	৩৩৩	১০৭	৪৪০
১৫	৩৩৩	১০৩	৪৩৬
১৬	৩৩৩	১০০	৪৩৩
১৭	৩৩৩	৯৭	৪৩০
১৮	৩৩৩	৯৩	৪২৬
১৯	৩৩৩	৯০	৪২৩
২০	৩৩৩	৮৭	৪২০
২১	৩৩৩	৮৪	৪১৭
২২	৩৩৩	৮০	৪১৩
২৩	৩৩৩'	৭৭	৪১০
২৪	৩৩৩	৭৩	৪০৬
২৫	৩৩৩	৭০	৪০৩
২৬	৩৩৩	৬৭	৪০০
২৭	৩৩৩	৬৩	৩৯৬
২৮	৩৩৩	৬০	৩৯৩

সপ্তাহ	শেয়ার ক্রয় (টাকা)	মুনাফা ভাগাভাগি (টাকা	মোট পরিশোধ (টাকা
২৯	৩৩৩	৫৭	৩৯০
৩০	৩৩৩	৫৩	৩৮৬
৩১	৩৩৩	৫০	৩৮৩
৩২	৩৩৩	৪৭	৩৮০
৩৩	৩৩৩	৪৩	৩৭৬
৩৪	৩৩৩	৪০	৩৭৩
৩৫	৩৩৩	৩৭	৩৭০
৩৬	৩৩৩	৩৩	৩৬৬
৩৭	৩৩৩	৩০	৩৬৩
৩৮	৩৩৩	২৭	৩৬০
৩৯	৩৩৩	২৩	৩৫৬
৪০	৩৩৩	২০	৩৫৩
৪১	৩৩৩	১৭	৩৫০
৪২	৩৩৩	১৩	৩৪৬
৪৩	৩৩৩	১০	৩৪৩
৪৪	৩৩৩	৭	৩৪০
৪৫	৩৪৮	৪	৩৫২
মোট (টাকা)		৩,৫০০	১৮,৫০০

৫

আরও কিছু

আরও কিছু উপায় অবলম্বন করলে টাকার কষ্ট দূর হতে পারে। যেমন-

প্রথমত: জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম নাগরিকের দায়িত্ব নিবে সরকার। তবে বেকার ভাতা দিয়ে নয়। সরাসরি পণ্য, সেবা ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে। সাথে কিছু নগদ টাকা দিয়ে টাকার কষ্ট দূর করতে পারে সরকার।

ব্যক্তি ও সামাজিক সংগঠনের ভূমিকাও থাকবে মানুষের টাকার কষ্ট দূর করার ক্ষেত্রে। ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব মূলত: রাষ্ট্রের। তারপর আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীদের। ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত একটি সমাজ পারে মানুষের টাকার কষ্ট দূর করতে।

দ্বিতীয়ত: নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে টাকার কষ্ট তেমন একটা থাকে না। এরূপ সমাজে পরস্পর দেখা হলে সালাম দিবে, শুভ সম্ভাষণ জানাবে। অসুখ হলে দেখতে যাবে।

লোকেরা একে অপরকে বিশ্বাস করবে। তাদের সম্পর্ক হবে শীসা ঢালা প্রাচীরের মতো। তারা একে অপরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকবে। অপরের কল্যাণ কামনায় মগ্ন থাকবে। দাওয়াত করে খাওয়াবে।

প্রত্যেক বেলায় কিছু না কিছু অন্যকে খাওয়ানো ব্যতীত নিজে কিছু খাবে না। এমন সব উন্নত মানের মজাদার খাবার তৈরী করে মানুষকে খাওয়াবে, যেসব খাবারের নাম মেহমান জানবে না। যে খাবারের স্বাদও সে কোনদিন পায়নি।

এতিম ও গরিবকে সাহায্য করে আনন্দ পাবে।

বাজারে বিক্রেতা জিনিসের দাম ভুল করে কম বললে ক্রেতা তা শুধরে দিয়ে বেশি মূল্য প্রদান করবে। কারও ভুলের সুযোগ কেউ গ্রহণ করবে না।

একজন ঋণ চাইলে অপরজন প্রদান করবে। ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সময় বাড়িয়ে দিবে। নইলে মাফ করে দিবে। নইলে ঋণী ব্যক্তির পক্ষে অপর জন ঐ ঋণ শোধ করবে। এজন্য কোনো সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

পরকালে জান্নাত লাভের আশায় সমাজে ভাল ভাল কাজের জন্য প্রতিযোগিতা থাকবে। সমাজ থাকবে ভাল কাজে ভরপুর। সাধারণতঃ সামাজিক অনুভূতি হবে–

মানুষ মানুষের জন্যে

জীবন জীবনের জন্যে।

একমাত্র "আল্লাহর সন্তুষ্টি" অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে। বৈধ উপায়ে টাকা আসবে টাকা যাবে। তাতে আনন্দ বেদনা অনুভূত হবে না। জীবন চলার পথে 'সবর' ও 'শোকর' থাকতে হবে।

অতএব, আয় বুঝে ব্যয় করতে হবে। ঋণ করে বড়লোকী ধরনের চালচলন (Ostentatious living) থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঋণ করে ঋণ শোধ করা যাবে না। লোক দেখানোর মানসিকতা পরিহার করে সাদাসিধে জীবন যাপন করতে হবে।

মনে রাখতে হবে-

ভোগে মুক্তি নেই

ত্যাগেই মুক্তি।

সক্রেটিস বলেছেন, "কত বেশি জিনিস ছাড়া আমি চলতে পারি" (How many things I can do without)। টাকার কষ্ট দূর করতে হলে সক্রেটিসের কথা মেনে চলতে হবে।

অর্থনীতিবিদ Say বলেছেন- 'সরবরাহ' তার 'নিজস্ব চাহিদা' সৃষ্টি করে (Supply creates its own demand)।

দ্রব্যের প্রতি ভালোবাসার কারণে এমনটি হয়ে থাকে। আমরা জানি না, চিনি না, এমন সব নিত্য নতুন জিনিস ভোগ করতে চাই। বাজারে খোঁজ করি। বিশেষ করে বিদেশ গেলে।

দ্রব্যের প্রতি ভালোবাসা অভাবকে অসীম করে তোলে।

অথচ দ্রব্যকে করতে হবে ব্যবহার। আর মানুষকে ভালোবাসতে হবে। কেননা মানুষই ভালোবাসা বুঝে। দ্রব্য তা বুঝে না। দ্রব্য সংবেদনশীল নয়; জড়। জড় পদার্থকে ভালবাসা অপদার্থের কাজ। তারপরও স্বীয় স্বার্থে আমরা মানুষকে করি ব্যবহার। দ্রব্যকে বাসি ভাল। কেননা দুনিয়াতে মানুষ এন অনেক বেশি বস্তুবাদী ও ভোগবাদী। কম ত্যাগী। এ প্রসংগে একটি গান হচ্ছে এ রকম–

এই দুনিয়া এখন তো আর

সেই দুনিয়া নাই

মানুষ নামের মানুষ আছে

দুনিয়া বোঝাই।

আমার দুখের কথা কইতে গেলে

এই দুনিয়ার সবাই বলে

শুনার সময় নাই।

হা...য় এখন বুঝি দারুণ সময়

বদলে গেছে দিন

কেউ আমারে চায়না দিতে

একটু সময় ঋণ।

ভালোবাসা পেতে হলে ভালোবাসা দিতে হয়। কিন্তু দ্রব্যের সাথে প্রেম বিনিময় করা যায় না। যায় মানুষের সাথে। দ্রব্যের প্রতি ভালোবাসা বস্তুবাদী ও ভোগবাদী মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখ দেয় বটে ! তবে অন্তরকে কাঁদায় এই বলে-

প্রেম তুই দে না আমায়

একটু পরিচয়।

আয় রোজগারে সক্ষম সকলে কর্ম তৎপর থাকবে। মনে রাখতে হবে-

আলস্য দারিদ্র্য আনে

পাপে আনে দুখ্।

সামাজিক সকল সুযোগ-সুবিধা সবার জন্য থাকবে উন্মুক্ত। শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন "কোন মানুষ অন্য মানুষের তুলনায় বড়ও নয়, ছোটও নয়।" অর্থাৎ নিজ নিজ অবস্থানে সকলেই গুরুত্বপূর্ণ।

গোটা সমাজ হবে একটি দেহের ন্যায়। কারোও মনে হবে না যে-

ডালিম পাকিলে পরে

রাগে ফেটে যায়

ছোট লোক বড় হলে

বন্ধুরে কাঁদায়।

সমাজে সকলে বাস করবে 'একই সমতলে'। উঁচু নিচু ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে। কেননা আল্লাহ্ সকল মানুষের প্রাণ একত্রে সৃষ্টি করেছেন। সকল মানুষের দেহ একই রকম। সবাই খায়-দায়-বেঁচে থাকে। এক দিন মরে যায়। কর্মফল (কিয়ামতে) দিবসে সব মানুষের পুনরুত্থান হবে। বিচার হবে। তাই সব মানুষ সমান।

বাজার হবে উন্মুক্ত। মূল্য নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অসাধু ব্যবসায়ের সুযোগও থাকবে না। নৈতিক ছাঁক্‌নিতে অযৌক্তিক চাহিদা, সরবরাহ ও মূল্য ছেঁকে ফেলা হবে। বাজার অসীম অভাব পূরণে সহায়ক হবে না। অসীম অভাব পূরণ করতে অসীম টাকার দরকার। তাইতো জীবন থেকে টাকার কষ্ট দূর হয় না। কবি বলেছেন-

এ জগতে হায়

সেই বেশি চায়

যার আছে ভুরি ভুরি।

অভাব কি অসীম হতে পারে?

যেখানে একবার একটির বেশি জামা ও এক জোড়ার বেশি জুতা পরা যায় না; একটির বেশি বাড়িতে বাস করা যায় না; এক জনমের বেশি বাঁচা যায় না।

অসীম অভাবের ধারণাটা এসেছে পুঁজিবাদ থেকে।

'অভাব অসীম' - এ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ সীমাহীন ভোগে আগ্রহী। তার ভোগস্পৃহা নিবারণ করতে অধিকতর উৎপাদন চাই। চাই অধিকতর বিনিয়োগ। বেশি বেশি বিনিয়োগ মানেই তো বেশি বেশি মুনাফা। ক্রমাগত মুনাফা মানেই তো পুঁজির বিকাশ।

তাই উৎপাদকগণ শক্তিশালী বিজ্ঞাপন প্রচার করে মানুষের ভোগ স্পৃহা তথা অভাবকে বাড়িয়ে তোলে।

প্রতিটি বিজ্ঞাপনের একটিই আবেদন- 'আমাকে কিনো' (Buy me) অর্থাৎ "পণ্যটি না হলে আপনার চলে না"।

প্রত্যুত্তরে মানুষের কথাও একটি- 'হ্যা আমি দেখলাম' (Yes! I see)। আর হয়ত মনে মনে ভাবে - 'পরে কিনতে হবে'।

"এখন নয় পরে" এই ইতিবাচক ভাবাবেগ অব্যাহতভাবে সৃষ্টি করতে পারাটাই ঐ বিজ্ঞাপনের সফলতা।

আর মানুষের ব্যর্থতা হলো- ঐ বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পা দিয়ে সীমিত অভাবকে অসীম করে তোলা এবং অসীম অভাব পূরণে বেশি বেশি টাকার সংস্থান করতে গিয়ে জীবনে টাকার কষ্ট জিইয়ে রাখা কিংবা বাড়িয়ে তোলা।

উৎপাদকেরা মানুষকে মানুষ মনে করে না। ভোক্তা (Consumer) মনে করে; যার নিজস্ব কোন পছন্দ নেই। উৎপাদকের পছন্দই ভোক্তার পছন্দ। কেননা উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী থেকেই ভোক্তা তার পছন্দের জিনিসটা ক্রয় করে থাকে।

তাই ভোক্তাকে নতুন পণ্যের খবর দিতে এবং তার পছন্দকে প্রভাবিত করতে বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বিজ্ঞাপন খরচসহ পণ্য মূল্য আদায় করা হয়। ভোক্তাগণ তা দিতেও রাজী থাকে। তাই বিজ্ঞাপন হচ্ছে বাজার অর্থনীতির মেরুদণ্ড।

বিজ্ঞাপনের প্রভাবে সৃষ্ট অসীম অভাব সামর্থ্যের বাইরেও জীবন যাপনে (Living beyond means) মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

ফলে সংসারে অভাব অনটন সবসময় লেগেই থাকে। কোন্ খরচ হওয়া উচিত কোন্ খরচ হওয়া উচিত নয়- এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। অভাবের তাড়নায় এক এক সময় মনে হয়-

সুখেরো লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু-
অনলে পুড়িয়া গেল।

কথায় বলে-

অভাব যখন দরজায় এসে দাঁড়ায়
ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়।

"অসীম অভাবের সংসার" নামক নাটকে স্বামী হলো নায়ক। আর স্ত্রী হলো নায়িকা। সন্তানেরা দর্শক। আর টাকা খল নায়ক; যে শুধু বিবাদ বাধায়। কষ্ট দেয়।

এ খল নায়ককে প্রতিহত করে সংসারে সুখ রচনা করতে হলে- 'সবর' এবং 'শোকরের' ভিত্তিতে নিজের আয়ের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। Plain living but high thinking দিয়ে wants are unlimited কে replace করতে হবে। তবে টাকার কষ্ট দূর হবে।

সংসারে সুখ আসবে। সে সুখ এমন সুখ; দম্পতিদের কেবল মনে হবে -

যে টুকু সময় তুমি থাকো কাছে
মনে হয় এ দেহে প্রাণ আছে,

বাকিটা সময় যেন মরণ আমার

হৃদয় জুড়ে নামে অথৈ আঁধার।

কিংবা

মোরা আর জনমে হংস মিথুন ছিলাম

ছিলাম নদীর ধারে,

যুগল রূপে এসেছি গো

আবার মাটির ঘরে।

শুধু কি তাই! মরে গেলেও সে প্রেম অটুট থাকে।

কবি জসিম উদ্দিনের ভাষায়-

এই খানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে

তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দু' নয়নের জলে।

মমতাজ মহলের জন্য শাহজাহান তাজমহল তৈরি করেছেন। নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলার কবরের পাশে প্রায় এক যুগ কেঁদে কেঁদে আলেয়া বেগমের মৃত্যু হয়েছিল।

তাই দ্রব্যকে নয়; আসুন মানুষকে ভালোবাসি। টাকার কষ্ট দূর করি।

টাকার কষ্ট দূর করতে হলে 'অপচয়' প্রতিরোধ করতে হবে।

ইংরেজী একটি প্রবাদ আছে Waste not want not অর্থাৎ 'অপচয় করোনা অভাবও হবে না'। অপচয় প্রতিরোধ আন্দোলনে শরীক হতে হলে অপচয় কি সবার আগে তা জানতে হবে।

অপচয় হলো-

এক. মন্দ কাজে টাকা খরচ করা।

দুই. ভাল কাজে টাকা খরচ করতে গিয়ে -

অতিরিক্ত খরচ করা;

সামর্থ্যের বাইরে খরচ করা;

লোক দেখানো ও

আত্মপ্রচারের জন্য খরচ করা।

অপচয় প্রতিরোধকারী ব্যক্তি আয় বুঝে ব্যয় করে। You earn you enjoy নীতি মেনে চলে। আয় হচ্ছে তার ব্যয়ের সীমা।

সে জানে আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ বলেছেন, "অপচয় করো না । নিশ্চই অপচয়কারী শয়তানের ভাই।"

অপচয় প্রতিরোধ করতে গিয়ে কৃপণতা করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, "[আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারাই] যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনও করে না, আবার কৃপণতাও করে না, বরঞ্চ তারা উভয় পন্থার মধ্যবর্তীতে অবস্থান করে।"

নৈতিক বিবেচনার উপর ভিত্তি করে রচিত মূল্যবোধকেন্দ্রিক বিচার ক্ষমতাকে নৈতিক ছাঁকুনি বা moral filter বলে। নৈতিক ছাঁকুনির ব্যবহার টাকার কষ্ট দূর করে। এ ছাঁকুনি অল্প টাকায় জীবনকে সাজাতে সাহায্য করে। আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে। অপার সুখে সুখী করে।

জীবনের অনেক ফালতু অভাব ও বেহুদা খরচ এ ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ফেলা যায়। তাতে অপচয় রোধ হয়। টাকার কষ্ট কমে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। টাকার মোহমুক্ত হয় মানুষ। টাকার কষ্ট দূর হয়।

ইসলামের প্রতি মারাত্মক অনীহা বা নির্লিপ্ততা টাকার কষ্টে থাকার আর একটি কারণ। ধর্মের প্রতি নির্লিপ্ত মানুষ সকল কাজ করে থাকে উপযোগবাদের ভিত্তিতে। যেখানে ঠিক বেঠিক, ভুল শুদ্ধ নির্ধারিত হয় প্রাপ্ত আনন্দ অথবা বেদনার মাপকাঠিতে।

যা কিছু আনন্দদায়ক তাই ভাল। যা কিছু বেদনাদায়ক তাই মন্দ।

এভাবে একটি যৌক্তিক ভিত্তি অন্তত: মনস্তাত্বিক রূপ লাভ করেছে সম্পদের একক অনুসরণ এবং ইন্দ্রিয় সুখানুভূতি লাভের জন্য।

এর ফলে 'অর্থনৈতিক মানুষ' নামক একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আপন স্বার্থ চিন্তাই হচ্ছে ঐ মানুষটির আসল কর্মপ্রেরণা। অর্থনীতির জনক Adam Smith বলেছেন, মানুষ আপন স্বার্থ দ্বারা তাড়িত (Man is driven by self interest).

পাষাণ পৃথিবীর পাষাণ মানুষ

স্বার্থের টানে সকলে বেহুঁশ।

সে পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেখানে টাকা তার প্রভু এবং ব্যাংক হচ্ছে উপাসনালয়। ভোগই তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য এবং সুখের প্রধান উৎস। তাই সে যে কোন দুঃখকেও Enjoy করে থাকে। বিরক্ত হতে চায় না।

এক ভদ্রলোক আমেরিকা থেকে মেয়েকে সাথে নিয়ে দেশে বেড়াতে এসেছেন। উঠেছেন ঢাকায় এক আত্মীয়ের বাসায়। রাতে মেয়েটি বললো, " Dad মশা কামড়াচ্ছে।" ভদ্রলোক বললেন, "Mom! Let's enjoy it" কিন্তু ঢাকায় মশার কামড় কি Enjoy করার মতো কিছু?

আসল কথা হলো– ঐ অর্থনৈতিক মানুষটির সকল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত যৌক্তিকতা হলো আয় বৃদ্ধি করা এবং অভাব পূরণ করা।

কিন্তু তার অভাব যেহেতু অসীম সেহেতু আপন স্বার্থে বিভোর ঐ মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হবার নয়। তাই প্রত্যাশিত সেই সুখ পাখিটি সে ধরতে পারে না বলে

নিজেকে ভিতর থেকে একাকী নিঃসঙ্গ মনে হয়।

'জনারণ্যে একা' থাকতে' সে ক্লান্তি বোধ করে। ক্লান্তি দূর করতে বেরিয়ে পড়ে আনন্দ ভ্রমণে। এক সময় মনে হয় শুধু ছুটে ছুটে চলা- একা একা কথা বলা- নিজের জন্য বেঁচে থাকা নিজেকে নিয়ে। দু'চোখের গহ্বরে শূন্যতা দেখে শুধু আর ভাবে-

সুখ তুমি কি

আমার জানতে ইচ্ছে করে

কিশোরীর ভালোবাসা নাকি........

এরূপ হতাশা টাকা খরচ করে বল্গাহীন (Laissez-faire) ও স্বার্থপর জীবন যাপনের ফসল। টাকার বিনিময়ে অর্জিত কষ্ট। টাকার কষ্ট।

হয়ত এরা ভাবে - পৃথিবী নিজেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। মানুষ কারো মুখাপেক্ষী নয়। যেমন খুশী তেমন জীবন যাপন করতে পারে। সুতরাং যেভাবেই হোক যত খুশী; আনন্দ লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাতে যদি কারো ক্ষতি হয় কিংবা পরিবেশ নষ্ট হয় তবুও । মানুষের আচরণ যৌক্তিকতা খুঁজে পায় শুধু মাত্র আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার মাঝে এবং যোগ্যতমের বেঁচে থাকার (Survival of the fitest) ধারণার মাঝে।

পক্ষান্তরে, মানুষ এবং মানুষের অধিকারভুক্ত সকল কিছুই যদি আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি হয় এবং মানুষ যদি আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে; তবে নিরঙ্কুশ স্বাধীন মনে করে মানুষ বল্গাহীন ও স্বার্থপর জীবন যাপন করতে পারে না।

যেহেতু আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেহেতু তিনি মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এবং ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে পরোপুরি জানেন। তাই মানুষের প্রয়োজন ও স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান দিতে তিনিই সক্ষম।

দিয়েছেনও তাই।

মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং ব্যবহারিক আইনকে সন্নিবেশ করে আল্লাহ তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকগণের (Messegers of God) মাধ্যমে একের পর এক বিধান নাযিল করেছেন। তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহকগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইব্রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ:) এবং হযরত মুহাম্মদ (স:)।

আল্লাহর বিধান 'দীন ইসলাম' মানুষের জন্য সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে; যাকে বলা হয় 'হুদুদ আল্লাহ'। এই সীমার মধ্যে মানুষ স্বাধীন। 'অবাধ বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা' তাকে মানায় না। মানুষ না পারে মাটি ভেদ করে নিচে নামতে; না পারে আকাশ ভেদ করে উপরে উঠতে। যদিও নজরুল বলেছেন

পাতাল ফেঁড়ে নামব নিচে

উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে

দেখব আমি জগতটাকে

আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

এরকম ভাবাবেগ আরও থাকতে পারে। যেমন- "আমার টিম জিতলে ষ্টেডিয়াম শুদ্ধ সবাইকে মিষ্টি খাওয়াবো।" কথাটা বেশ চমৎকার। বাস্তবতা কিন্তু ঋণ। এক পেকেট মিষ্টি নিয়েও গ্যালারিতে বসা যাবে না। বিতরণের আগেই.....।

দুনিয়াতে যত ভাল কথা আছে ততো ভাল কাজ নেই। করাও কঠিন। আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি করেছেন পরকালের জন্য। আল্লাহ বলেন, "দুনিয়ার জীবনের চাইতে আখিরাতের জীবন উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী।"

অতএব অব্যাহত উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও ভোগ পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ বলে মনে হচ্ছে (Systematic growth & systematic foreclouser).

তবুও এখানে রোজ সৃষ্টি হচ্ছে অগাধ টাকা। সাথে টাকার কষ্ট। তাই মনে হচ্ছে পুঁজিবাদ সে তো অভিশাপ।

'ধনের সাথে মনের সম্পর্ক' টাকার কষ্টের অন্যতম কারণ।

কবির ভাষায় -

রাজা বড় ধনের কাতর

টুনটুনির টাকা নিল বাড়ির ভিতর।

ধনী লোকেরা অধিক টাকা খরচে আনন্দ লাভ করে থাকেন। বেশি টাকা খরচ সমাজিক মর্যাদার (Social Status) প্রতীক। লোক দেখানো ব্যয়বহুল জীবন যাপনে (Ostentatious Living) অভ্যস্ত ধনীদের নিকট টাকার প্রান্তিক মূল্য (Marginal Value) কম।

জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে তাঁরা যত টাকা খরচ করেন তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা খরচ করেন 'নান্দনিক সৌন্দর্য' উপভোগের আনন্দ লাভে। এ ব্যাপারে তাঁরা এতটা সিরিয়াস যে মুক্ত হস্তে অর্থাৎ বিনা লাভে (দুনিয়াবী লাভ) একটা টাকাও খরচ করেন না। ফলে সমাজ কাঠামো হয়ে পড়ে শ্রেণী ভিত্তিক তথা পিরামিডের মতো।
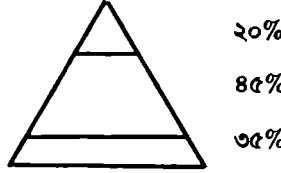
এ সমাজে ২০% ধনী লোকের কাছে ৮০% সম্পদ আছে বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে ৮০% গরিব লোকের নিকট ২০% সম্পদ রয়েছে। ১৯৯৮ সনে প্রকাশিত জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিশ্বের সেরা ধনী ২২৫ জন ব্যক্তির নিকট ২৫ কোটি গরীবের সম্পদের চাইতেও বেশী সম্পদ রয়েছে। ধনীদের কুকুর রোজ যা খায় গরিব তা পায় না।

এমতাবস্থায় উৎপাদকরা নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগে আনন্দ লাভের সামগ্রী উৎপাদনে বেশি আগ্রহী থাকে; মৌলিক চাহিদা পূরণের সামগ্রী উৎপাদন করার চাইতে। কেননা বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন খরচ কম। লাভ অনেক বেশি।

ধনীরা বিলাস সামগ্রী কিনতে টাকার চিন্তা করে না। জিনিসটি পেলেই হলো। ধনের সাথে মনের এ সম্পর্ক মৌলিক চাহিদা পুরণের সামগ্রী আরও সস্তায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বাধা।

তাই গরিবরা বেশি দাম দিয়ে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামগ্রী কিনতে বাধ্য হয়। কথায় বলে- ধনীদের ভোগ-বিলাসিতা দারিদ্র্যের কারণ।

ধনী-গরিবের ব্যবধান কমাতে না পারলে দারিদ্র্যতার দুষ্ট চক্রে (Vicious Circle of Poverty) থাকবে গরিবের নিত্য বসবাস। চক্রটি হচ্ছে- একজন মানুষ গরিব। কারণ সে গরিব | (A man is poor because he is poor) দারিদ্র্যতা গরিবকে গরিব রাখে।

দারিদ্র্য–

গরিবের জীবন যন্ত্রণা

মধ্যবিত্তের আলোচনার বিষয়

ধনীদের বিনিয়োগ ক্ষেত্র।

তাই দারিদ্র্যতা প্রলম্বিত হয়, কষ্টে থাকে গরিব। সে কষ্ট টাকার কষ্ট।

এ কষ্ট দূর করতে হলে ধনের সাথে মনের সম্পর্ককে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে। হুদুদ আল্লাহর অনুসরণ করতে হবে। তাহলে সমাজ কাঠামো পিরামিডের মতো হবে না। নিম্নরূপ হবে–

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে এটাকে বলা হয় স্বাভাবিক বণ্টন রেখা (Normal distribution curve)। এখানে সম্পদের বণ্টন স্বাভাবিক থাকে হুদুদ আল্লাহর অনুসরণের ফলে। ধনী গরিবের ব্যবধান থাকে বটে। তবে তা গাছতলা-পাঁচতলা নয়।

অনেকটা হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মতো। আঙ্গুলগুলো বাঁকা করে একত্রিত করলে এক বিন্দুতে মিলিত হয়। সে বিন্দু ঐক্যের। সহযোগিতার। পাশাপাশি অবস্থানের। ভালোবাসার। শান্তির।

৬

শেষ কথা

টাকার গেঁড়াকলে আটকে গেছে জীবন। এখন আর্থিক মন্দায় আক্রান্ত পৃথিবী। জাতিসংঘ মহাসচিব বান্ কি মুন বলেছেন, "মন্দার ফলে শিশু মৃত্যুর হার বাড়বে। গরীব মানুষের টিকে থাকা মুশকিল হবে।"

অতএব সাধু সাবধান!

মন্দা মোকাবিলায় ৭০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে (Bail out plan) যুক্তরাষ্ট্র। এ অর্থ দিয়ে ব্যাংকের খাট্রা ঋণ (Toxic credit) শোধ করা হবে।

তাতে মার্কিন জনগণের উপর ট্যাক্স বাড়বে। লাভবান হবে ব্যাংক মালিক।

তাতে ফল হলো Socialization of pain privatization of gain. তাছাড়া এ Bail out plan পুনরায় খাট্রা ঋণ সৃষ্টি না হওয়ার রক্ষা কবচ নয়। কারণ পুঁজিবাদ অপরিবর্তিত থেকে গেল।

অতএব কিছুকাল পরে অবস্থা হবে তথৈবচ । যথা পূর্বং তথা পরং।

এ অবস্থা আঁচ করতে পেরে আবার ৭৮৭ বিলিয়ন ডলারের 'গতিশীল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' (Economic Stimulas Plan) গ্রহণ করা হয়েছে। এ অর্থ দ্বারা জনগনকে ট্যাক্স সহয়তা (Tax credit) প্রদান করা হবে।

অতএব মোট ১৪৮৭ বিলিয়ন ডলার খরচের ফলে আরও ১৮৫ বিলিয়ন ডলার বাজেট ঘাটতি সৃষ্টি হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২০০৯ সালে। ফলে ঐ দেশে মোট বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। যা জিডিপির ১০ শতাংশ। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা হবে সর্বোচ্চ বাজেট ঘাটতি। ফলে দেশটিতে দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব ভীতি (Fiscal fears) দেখা দিয়েছে। আর তাই উদ্বিগ্নতা বাড়ছে সর্বত্র। সবাই মন মরা হয়ে পড়ছে।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ ড. ফরেস্ট কুকসনের মতে– মন্দা উত্তোরণে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। ডেমোক্রেটদের তৈরী নীতিমালা মন্দাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে আর রিপাবলিকানরা মন্দার ভয়াবহ পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছে না। উভয় রাজনৈতিক দলের জন্য বিষয়টি এখন মাথা নিমজ্জিত উট পাখির মতো এবং ইহার অন্ধকার দিকটিই অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্দেশ করছে।

তা ছাড়া মোট ১৪৮৭ বিলিয়ন ডলার খরচের ফলে 'ঘাটতি বাজেট' ওয়ালা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এ মূল্যস্ফীতি হতে পারে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। এক দিকে মন্দার ফলে নগদ অর্থের অভাব। অন্য দিকে বাজারে মূল্য বৃদ্ধি।

পূর্বের মন্দা কেটে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে। এখন পারমাণবিক বোমা দেশে দেশে। তাই বর্তমান মন্দা কেটে উঠ্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা কম। নেই বললেই চলে।

পূর্বের মন্দা সৃষ্টি হয়েছিল ডলার সরবরাহ সংকুচিত হওয়াতে। ঐ মন্দা কেটেছিল ডলার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়াতে। আর বর্তমান মন্দা সৃষ্টি হয়েছে অধিক পরিমাণে ডলার সরবরাহের ফলে। তাই মন্দা কেটে উঠার জন্য 'ডলার বাতিল' ঘোষণা করে নতুন মুদ্রা চালু করতে হতে পারে। এছাড়া বাজার থেকে ডলার তুলে নেওয়ার জন্য অন্য কোন উপায় নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো Open Market Operation নীতির প্রয়োগ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তাতে এক হিসাব মতে প্রায় ৬৬% অর্থ (ডলার) ফেরত পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেশে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে ডলার রিজার্ভ রয়েছে তার কি হবে? যেহেতু ডলার আর্ন্তজাতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে একক মুদ্রা, সেহেতু আর্ন্তজাতিক বিনিময় ব্যবস্থারই বা কি হবে? তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থ বিনিয়োগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তাই সংকট বেশ গভীরে। তবে সংকটের কারণ তার কিছুটা সমাধান নির্দেশ করে।

টাকার কষ্ট বাড়ছে সর্বত্র। পুঁজিবাদের সৃষ্ট 'অর্থনৈতিক মানুষ' মরে যাচ্ছে। আরও মরবে। কেননা বাস্তবতা বড় নির্মম।

এ নির্মম বাস্তবতা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেছেন-

তারপর--------

সেই নারী সিঁথিতে সিঁদুর মেখে

চলে যায়

অন্য এক যুবকের সাথে।

কারণ

জীবন জীবনই

খেলার মাঠও নয় কবিতাও নয়।

এক টুকরা কাগজে ক্রয় ক্ষমতা আরোপ করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু হয়েছিল টাকা।

তারপর টাকা হলো M1, M2, M3. অর্থাৎ Accounting থেকে Digital.

সে টাকার হিসাব রাখতে Accrual accounting system চালু হলো। Actual accounting system উঠে গেল। ক্রমশঃ টাকার সংকট উঠেছে চরমে।

সংকট মোকাবেলায় চরিত্র হারালো মানুষ। অথচ ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে-

Money is lost

Nothing is lost

Time is lost

Something is lost

But character is lost

Everything is lost.

সব কিছু হারিয়ে চলা যায় না। হারানো জিনিস ফিরে পেতে হয়।

অতএব ফিরে আসতে হবে সোনালী অতীতের সেই নৈতিক মানুষ। ঈমানদার। নেক আমলকারী। পরহেজগার। মুত্তাকী।

আসতেই হবে।

Natural Justice বলে তো একটা কথা আছে। Poetic justice ও বলতে পারেন।

কবির ভাষায় -

মধ্য দিনের আলোর দোহাই

নিশার দোহাই ওরে

প্রভু তোরে ছেড়ে যান নি কভু

ঘৃণা না করেন তোরে।

অসহায় যবে এসেছিলি জগতে

তিনিই দিয়েছেন ঠাঁই

তৃষ্ণা ও ক্ষুধা যা ছিল তোর

ঘুছিয়ে দিয়েছেন তাই।

আল্লাহ বলেন, "সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত। সত্যের বিজয় অনিবার্য।"

ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ নৈতিক উন্নয়নে তেমন গুরুত্ব প্রদান করে না। কিন্তু বর্তমানে তারাও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

নৈতিক উন্নয়ন ব্যাতীত ন্যায়ভিত্তিক বস্তুগত উন্নয়ন সম্ভব নয়। টাকার কষ্টও দূর করা সম্ভব নয়।

ড. মুহাম্মদ ইউনুস বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বর্তমান মন্দা কেটে উঠার কথা বলেছেন।

কিন্তু তিনি একটি শক্তিশালী বাজার ব্যবস্থার জন্য Moral filter ব্যবহার করার কথা বলেননি। তিনি যা বলেছেন ভালই বলেছেন। না বললে আরো ভাল করতেন।

টাকার কষ্ট দূর করতে সকল সম্পদের বন্টন দক্ষতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে হতে হবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নৈতিকতা দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে।

এর জন্য প্রয়োজন একটি নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন, সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বচ্ছ পরিস্রাবক ব্যবস্থা (Filter mechanism) এবং একটি শক্তিশালী প্রেরণা (Strong motivation) যেন ব্যক্তি ঐ ব্যবস্থা ও প্রেরণা অনুযায়ী চলতে পারে।

আর্থ-সামাজিক সংস্কার সাধন করতে হবে যেন দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বহুমাত্রিক ব্যবহার করা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না ন্যায় ও দক্ষতা অর্জিত হয়।

তবেই আশা করা যায়-টাকার কষ্ট দূর হতে পারে। শান্তি লাভ হতে পারে।

– সমাপ্ত –

লেখক পরিচিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে মাষ্টার্স ডিগ্রী প্রাপ্ত

ড. মাহমুদ আহমদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। আর তিনি ইরানে ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তিনি সোনালী ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থায় ফিন্যানসিয়াল এনালিষ্ট ছিলেন। দশ বছর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) এ ফ্যাকাল্টি মেম্বার ছিলেন। বর্তমানে একটি প্রাইভেট ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট।

তিনি দেশে বিদেশে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আইডিবির আমন্ত্রণে মিশর, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ব্রুনাই দারুস্‌সালাম, আবুধাবী, দুবাই ও সৌদি আরব ভ্রমণ করেন।

ড. মাহমুদ আহমদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য এবং অন্যান্য দেশী বিদেশী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। লাহোর স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে প্রকাশিত 'দি লাহোর জার্নাল অব ইকোনমিক্স' এর সম্পাদকীয় উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। দেশী বিদেশী প্রফেশনাল জার্নালে তাঁর তেইশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ১৯৬০ সালে লক্ষীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার

www: ahsanpublication.com